রিপোর্টিং হ্যান্ডবুক

সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনা

মিরাজ আহমেদ চৌধুরী

রিপোর্টিং হ্যান্ডবুক

সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনা

মিরাজ আহমেদ চৌধুরী

British
High Commission
Dhaka

MRDI

© ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)

প্রকাশকাল : ২০১৫

ISBN : 978-984-33-8544-4

অলংকরণ ও মুদ্রণ : ট্রান্সপারেন্ট

বাংলাদেশে মুদ্রিত

ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ
৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড (৪র্থ তলা), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : +৮৮-০২-৯১৩৪৭১৭, +৮৮-০২-৯১৩৭১৪৭
ইমেইল : info@mrdibd.org, ওয়েবসাইট : www.mrdibd.org

বিষয়সূচি

ভূমিকা		১
প্রথম অধ্যায়	: পটভূমি	৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	: বাংলাদেশে সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনা	৬
তৃতীয় অধ্যায়	: বাজেট ও প্রতিবেদনের সম্ভাব্য ক্ষেত্র	১৩
চতুর্থ অধ্যায়	: ব্যয় ব্যবস্থাপনায় যত দুর্নীতি	১৭
পঞ্চম অধ্যায়	: সরকারি ক্রয়ের ধাপ ও দুর্নীতি চেনার উপায়	২৬
ষষ্ঠ অধ্যায়	: তথ্যের সম্ভাব্য উৎস	৩৪
সপ্তম অধ্যায়	: যে সকল আইন জানা প্রয়োজন	৪৪
অষ্টম অধ্যায়	: সংবাদে সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনা	৪৮
নবম অধ্যায়	: সংখ্যার ব্যবহার	৬২
দশম অধ্যায়	: শব্দকোষ	৭১
সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনার খবর যেসব ওয়েব ঠিকানায়		৯৭
তথ্যসূত্র		৯৯

ভূমিকা

বাংলাদেশের মতো দেশে সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এ দেশে সম্পদ সীমিত। করদাতার সংখ্যাও জনসংখ্যা অনুপাতে খুব বেশি নয়। তাই খরচের বড় অংশই ঋণ থেকে মেটাতে হয়। সেই ঋণ পরিশাধের দায় আবার করদাতাদের ঘাড়েই চাপে। যথাযথভাবে টাকা খরচে সরকারের সীমাবদ্ধতা যে শুধু উন্নয়নের গতিকে সীমিত করে তা নয়, শেষ পর্যন্ত এর দায় জনগণকেই মেটাতে হয়। এ কারণে বাজেটের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক জানা একজন প্রতিবেদকের জন্য খুবই জরুরি।

সরকার কীভাবে টাকা খরচ করে, সেই টাকা কীভাবে সংগ্রহ হয়, তার একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো আছে। সেই কাঠামোটিকে রিপোর্টারদের কাছে সহজবোধ্য করতেই ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই) এই হ্যান্ডবুক প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছে।

বাজেট, উন্নয়ন ব্যয়, অনুন্নয়ন ব্যয় বা রাজস্ব আদায়—এসব বিষয় কমবেশি সবার জানা। এসব নিয়ে দেশের গণমাধ্যমে প্রতিনিয়তই সংবাদ ছাপা বা প্রচার হয়। বিচ্ছিন্নভাবে নিরীক্ষা, পরিবীক্ষণ বা মূল্যায়নের মতো বিষয় নিয়ে প্রতিবেদনের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। এ সবকিছুই তহবিল ব্যবস্থাপনার অংশ।

অনেকের কাছেই আপাতবিচ্ছিন্ন এমন বিষয়গুলোকে একটি মোড়কে আনার চেষ্টা করা হয়েছে এই হ্যান্ডবুকে। যাতে, তহবিল ব্যবস্থাপনার প্রতিটি ধাপ এবং তাদের মধ্যে অন্তঃসম্পর্ক সহজে বোঝা যায়। একই সঙ্গে প্রতিটি ধাপে প্রতিবেদনের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো কোথায়, দুর্নীতি বা অনিয়মের চিহ্নগুলো কেমন, অনুসন্ধানের জন্য কোথায় গভীরভাবে দেখতে হবে, কোথায় তথ্য পাওয়া যাবে, এসব বিষয়কে সংক্ষেপে তুলে আনা হয়েছে।

হ্যান্ডবুকটি সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জনের জন্য নয়। এর উদ্দেশ্য মূলত প্রায়োগিক। যেন একজন প্রতিবেদক প্রত্যন্ত গ্রামের ছোট কোনো রাস্তা তৈরিতে অনিয়মের সঙ্গেও সরকারের দক্ষতা, নাগরিকের জীবনমান আর তাদের পকেটের

সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। যেন কোনো ছোট বা সাধারণ ইঙ্গিত থেকে তার মনে প্রশ্ন তৈরি হয়, যে প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা তাকে আরো গভীর অনুসন্ধানে উৎসাহিত করে।

সাধারণভাবে গণমাধ্যমে তহবিল ব্যবস্থাপনাকে শুধু অর্থনীতি বিটের বিষয় বলে মনে করা হয়। কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অপরাধ থেকে শুরু করে পরিবেশ, প্রযুক্তি এমনকি রাজনীতির মতো বিটের জন্যও অসংখ্য প্রতিবেদনের উৎস হতে পারে এই বিষয়। দেশের গণমাধ্যমে সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রতিবেদন তৈরিতে এই হ্যান্ডবুক সামান্য সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারলেও আমাদের প্রচেষ্টাকে সার্থক বলে মনে হবে।

সংবাদমাধ্যমে তহবিল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সংবাদ ও রিপোর্টের ধরন ও গুণগত মান পর্যালোচনা করে তহবিল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক এবং মিডিয়া বিশেষজ্ঞের পরামর্শক্রমে এই বইয়ের একটি রূপরেখা ও বিষয়বস্তু ঠিক করা হয়েছে। বিষয়বস্তু নির্ধারণে বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান করেছেন সাবেক কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল এবং বর্তমানে ব্র্যাকের ন্যায়পাল আহমেদ আতাউল হাকিম; সাবেক বিভাগীয় প্রধান, আইএমইডি ও সাবেক মহাপরিচালক, সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, অমূল্য কুমার দেবনাথ; ফিনানসিয়াল এক্সপ্রেসের সম্পাদক মোয়াজ্জেম হোসেন; দি ডেইলি স্টারের ডেপুটি এডিটর ইনাম আহমেদ; একাত্তর টিভির পরিচালক বার্তা সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা এবং প্রথম আলোর হেড অব রিপোর্টিং শওকত হোসেন মাসুম।

বইটির পাণ্ডুলিপি পর্যালোচনা করেছেন সাবেক বিভাগীয় প্রধান, আইএমইডি ও সাবেক মহাপরিচালক, সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, অমূল্য কুমার দেবনাথ এবং ফিনানসিয়াল এক্সপ্রেসের পরিকল্পনা সম্পাদক আসজাদুল কিবরিয়া। তাঁদের সবার প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা। মাছরাঙা টেলিভিশনের বিজনেস এডিটর মিরাজ আহমেদ চৌধুরী অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বইটি রচনা করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

ব্রিটিশ হাইকমিশনের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত এমআরডিআই-এর স্থানীয় সরকার বাজেট পর্যবেক্ষণ প্রকল্পের আওতায় বইটি প্রকাশিত হলো। এই বইয়ে প্রকাশিত মন্তব্য, মতামত ও তথ্য ব্রিটিশ হাইকমিশন কিংবা ব্রিটিশ সরকারের মতামতের প্রতিফলন নয়।

ব্রিটিশ হাইকমিশনের প্রতি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত এমআরডিআই-এর সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

প্রথম অধ্যায়
পটভূমি

'তহবিল ব্যবস্থাপনা' শব্দটির সঙ্গে পরিচয় থাকুক বা না থাকুক, আমরা প্রতিনিয়তই এই বিষয়ে সংবাদ দিয়ে যাচ্ছি। বাজেট থেকে শুরু করে রাজস্ব আয়-ব্যয়, সরকারি প্রতিষ্ঠানের লোকসান, প্রকল্প বাস্তবায়ন বা বাস্তবায়নে দুর্নীতি, বহুজাতিক দাতা সংস্থার সঙ্গে ঋণ চুক্তি, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক, অর্থনৈতিক বিষয় বা ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে প্রস্তাব অনুমোদন—এ সবই তহবিল ব্যবস্থাপনার একেকটি অংশ।

কোনো হাসপাতালে ডাক্তার নেই, অনেক টাকায় কেনা সরঞ্জাম ব্যবহার করা হচ্ছে না, বিনা মূল্যের ওষুধ বিক্রি হচ্ছে খোলাবাজারে, স্কুলের পাঠ্যবই ছাপা হচ্ছে নিম্নমানের কাগজে, বয়স্কভাতার টাকা চলে যাচ্ছে প্রভাবশালীদের পকেটে, তৈরির কয়েক মাসের মাথায় ভেঙে পড়েছে নদীর বাঁধ অথবা নবনির্মিত ভবনে দেখা দিচ্ছে ফাটল—পত্রিকার পাতায় এ ধরনের শিরোনাম প্রায়ই চোখে পড়ে। মানুষের জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত এসব খবরও সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনারই অংশ। খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা, নাগরিক সেবা—কিছুই এর বাইরে নয়। যেখানেই সরকার টাকা খরচ করছে অথবা যেখান থেকেই সরকার টাকা তুলছে—এমন সব ক্ষেত্র সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনার আওতায়।

তাই খবরের বিষয়বস্তু হিসেবে এটি অনেক পুরোনো। প্রতিটি টেলিভিশনে, প্রতিটি খবরের কাগজে এ-জাতীয় সংবাদ প্রচার বা ছাপা হচ্ছে। সেসব প্রতিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, সরকারি টাকার অপচয়, দুর্নীতি বা অব্যবস্থাপনার মতো বিষয়গুলো বড় হয়ে উঠে আসছে। একই সঙ্গে এটাও সত্য, সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনার সঙ্গে একজন নাগরিকের জীবনের দ্বিমুখী যোগসূত্রের বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট রয়ে যাচ্ছে।

'দ্বিমুখী যোগসূত্র' বিষয়টি পরিষ্কার করা প্রয়োজন। তহবিল ব্যবস্থাপনা মানে হলো আয় আর ব্যয়। যার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে টাকা, এক দিকে সরকার আর অন্য দিকে জনগণ। সরকার খরচ করে জনগণের জন্য—এটা সম্পর্কের এক দিক। অন্য দিক হলো, সরকার এই টাকা নিচ্ছে জনগণেরই কাছ থেকে, আমার-আপনার দেয়া করের মাধ্যমে। তাই আমার টাকা

সরকার কীভাবে খরচ করছে, দিন শেষে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। প্রত্যেক নাগরিকেরই তা জানার অধিকার আছে। আর এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টাই যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বড় বড় সব খবরের জন্ম দিয়েছে।

'আমার টাকা' ধারণাটি নাগরিকের মনে যত বেশি বদ্ধমূল হবে, ততটাই সে সচেতন হবে এই টাকার ব্যবহার নিয়ে। ততটাই প্রশ্ন উঠবে, এই টাকা কীভাবে খরচ হচ্ছে। আর এই প্রশ্ন যত বেশি আসবে, সরকারের জবাবদিহি ততটাই বাড়বে। একই সঙ্গে স্বচ্ছতাও নিশ্চিত হবে তহবিল খরচে।

বাংলাদেশে 'আমার টাকা' শব্দটি এখনো নাগরিকের অধিকারবোধের সমার্থক হয়ে ওঠেনি। জনগণ এখনো প্রশ্ন করতে শেখেনি 'আমার টাকা কোথায় যাচ্ছে'। আর এ কারণেই সোনালী ও বেসিক ব্যাংকের দুর্নীতি সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনার বিষয় হয়ে ওঠে না। একের পর এক কেলেঙ্কারিতে বাড়তে থাকে খেলাপি ঋণ আর মূলধন ঘাটতি। সেই লোকসান সামাল দেয়া হয়, বাজেটের টাকায়। পুনঃ অর্থায়নের নামে চাপিয়ে দেয়া হয় জনগণের ঘাড়ে। এখানে দুর্নীতি আলোচনার বড় বিষয়বস্তু হয়। কিন্তু আমার টাকায় যে দুর্নীতির দায় শোধ করা হচ্ছে, সেই টাকা আমার আরো কত কাজে আসতে পারত, এমন সব প্রশ্ন উপেক্ষিত থাকে।

ঠিক একই কারণে দিনের পর দিন ময়লা পানি সরবরাহ করেও ওয়াসাকে জবাব দিতে হয় না, বাড়ির ফোনলাইন নষ্ট হলে সরকারি কর্মচারীকে ঘুষ দিয়ে তা ঠিক করাতে হয়, পুলিশের কাছে সেবা পেতেও যেতে হয় ভয় আর সংকোচ নিয়ে। গোটা সরকারব্যবস্থা চলছে আমার টাকায়, এই অধিকারবোধ জন্ম না নেয়ায়, মানুষও প্রতিনিয়তই বঞ্চিত হয় সরকারি সেবা থেকে।

সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনার সঙ্গে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক সরাসরি জড়িত। প্রতিবছর সরকার একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা খরচ করে। এর মধ্যে বড় একটি অংশ সরাসরি বিনিয়োগ হয়। একটি অংশ খরচ হয় সরকার পরিচালনা আর নানা ধরনের সেবায়, যা বেসরকারি খাতকে সচল রাখতে সহায়তা করে। এই বিনিয়োগের ওপর নির্ভর করে একটি দেশের অর্থনীতি কোন দিকে এগোবে, সেই এগিয়ে চলার গতিই বা কেমন হবে। তাই সরকার পর্যাপ্ত টাকা সংগ্রহ করতে না পারলে, উন্নয়নের জন্য কাঙ্ক্ষিত বিনিয়োগ হয় না। সেই টাকা ঠিকমতো খরচ না হলে, বিনিয়োগ থেকে সুফলও পাওয়া যায় না।

সাধারণত অদক্ষতা আর কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে সরকার পর্যাপ্ত আয় থেকে বঞ্চিত হয়। আর দুর্নীতি, অনিয়ম এবং অব্যবস্থাপনার কারণে ব্যয়ের টাকা অপচয় হয় অথবা কোনো কাজে আসে না। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এর হিসাবে, দেশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষকেই সরকারি সেবা পেতে দুর্নীতির শিকার হতে হয়। এর ফলে একজন অবস্থাপন্ন মানুষের তুলনায় একজন দরিদ্র মানুষ চার গুণ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। বিশ্বব্যাংক বলেছে, এই দুর্নীতি না থাকলে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির মাথাপিছু প্রবৃদ্ধি বছরে আরো ২ থেকে ৩ শতাংশ বাড়ত।

এখানেই গণমাধ্যমের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনা নিয়ে যত বেশি খবর ছাপা হবে, জনগণও ততটাই সচেতন হবে। তত বেশি প্রশ্ন করতে শিখবে, 'আমার টাকা কোথায় যাচ্ছে?'। সরকারও তখন সচেতন হবে নাগরিকের দেয়া টাকা খরচ করতে গিয়ে। একই সঙ্গে বাড়বে সেবার মান, কমবে দুর্নীতি, জবাবদিহিও প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজের সব স্তরে, যা শেষ পর্যন্ত উন্নয়নের গতিকে আরো বাড়িয়ে তুলবে।

আগেই বলা হয়েছে, দেশের গণমাধ্যমে সরকারি সেবা, উন্নয়ন প্রকল্প বা অর্থায়নের মতো বিষয় নিয়ে প্রতিবেদন নেহাত কম ছাপা হয় না। কিন্তু এই সব খবর কি একজন নাগরিকের মনে সেই প্রশ্নের জন্ম দিতে পারছে? একজন পাঠক প্রতিবেদন পড়ে, সরকারি তহবিলের সঙ্গে নিজের জীবনমান বা পকেটের সম্পর্কটাকে কতটা আঁচ করতে পারছেন? জরুরি এই বিষয়গুলো প্রতিবেদনে তখনই উঠে আসবে, যখন একজন সংবাদকর্মীর জানা থাকবে, সরকার কোন প্রক্রিয়ায় টাকা সংগ্রহ বা খরচ করে, আর এর সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সম্পর্ক কোথায়। তহবিল ব্যবস্থাপনার ধাপগুলো জানা থাকলে প্রতিটি পর্যায়ে প্রতিবেদনের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো খুঁজে বের করা সহজ হয়। আর তার সঙ্গে জীবনের যোগসূত্র জানা থাকলে সেই প্রতিবেদন পাঠক অনেকদিন মনে রাখে এবং তা মানুষকে সচেতন হতেও সাহায্য করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনা

তহবিল ব্যবস্থাপনা

একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের গল্প দিয়েই শুরু করা যাক। এখানে মূল চরিত্রের নাম আবুল কাসেম। বয়স ৩৮ ছুঁই ছুঁই। চাকরি করেন বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানে। বেতন পান ৪০ হাজার টাকা। মাস জুড়ে পাঁচ সদস্যের পরিবারের খরচ সামলানোর জন্য তার তহবিল এটাই। কিন্তু এতে কি চলে? মাস শেষে শুধু বাড়িভাড়া গুনতে হয় ১২ হাজার। বাকি যা থাকে চলে যায় খাওয়াদাওয়া, তিন সন্তানের শিক্ষা, মোটরসাইকেলের তেল আর বিদ্যুৎ-গ্যাসের বিলে। সঙ্গে মাসের শুরুতেই গ্রামের বাড়িতে বুড়ো বাবা-মার জন্য টাকা পাঠানো, সামাজিক অনুষ্ঠান আর উপহারের মতো খরচ তো আছেই। সব মিলে টানাটানির এক সংসার।

তাই হঠাৎ করেই কেউ অসুস্থ হলো, ঘরের টিভি ফ্রিজ কিছু নষ্ট হলো, কিংবা গ্রামের বাড়ির কোনো সংস্কার কাজে টাকার দরকার—বড় খরচের কোনো এমন উপলক্ষ তৈরি হলে, ধার বা ঋণ করাটাই তখন একমাত্র সমাধান। এমন ঘটনা প্রতিমাসেই লেগে থাকে। একবার বোনের বিয়ে দিতে গিয়ে নিজের পকেট থেকে খরচ হয়েছিল তিন লাখ টাকা। এর পুরোটাই ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়া। তাই আয়ের একটা অংশও চলে যায় ধার শোধে। বছরে বছরে বেতন বাড়ে ঠিক। কিন্তু খরচ সেই সীমা ছাড়িয়ে যায় প্রতিনিয়তই।

এই চাপ সামাল দিতে অনেক দিকেই নজর রাখতে হয় কাসেম সাহেবকে। কাজের ছেলেটা বাজারের টাকা চুরি করল কি না, তা না হলে খরচ বেড়ে যাবে খাবারে। বাড়ির রাজমিস্ত্রিটা ছাদে কমদামি টিন লাগাল কি না, তাহলে তো কদিন পর আবার বদলাতে হবে! ছেলেমেয়েরা ঠিকমতো পড়াশোনা করছে তো? নয়তো গৃহশিক্ষক বা কোচিংয়ে দিতে হবে। বাবা-মার ওষুধে অবহেলা হলে আবার কোন বিপদ আসে, তখন চিকিৎসার খরচও সীমা ছাড়াতে পারে। প্রতিমুহূর্তের চিন্তা যাতে অপচয় না হয়, অল্প টাকা দিয়েই যাতে সর্বোচ্চ ফল

পাওয়া যায়। তাই তার কাছে ভালো থাকা মানে প্রাচুর্য নয়, সীমিত আয়কে এমনভাবে ব্যবহার করা, যাতে নিজে ভালো থাকা যায়, সঙ্গে সবাইকেও ভালো রাখা যায়। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য এটাই তহবিল ব্যবস্থাপনা।

এখানে একজন আবুল কাসেমের সঙ্গে একটি বাংলাদেশ সরকারের কোনো পার্থক্য নেই। এই ব্যক্তি যেমন দায়বদ্ধ পরিবারের সদস্যদের ভালো রাখতে, তেমনি সরকারও চায় সীমিত তহবিল দিয়ে জনগণের কল্যাণ আর রাষ্ট্রের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অবদান রাখতে। পার্থক্য এটাই: কাসেম সাহেব খরচ করেন নিজের আয় থেকে, দায়ও মেটান নিজেই। আর সরকার খরচ করে পরের টাকা, জনগণের কাছ থেকে নিয়ে, জনগণের জন্য। যেহেতু টাকার মালিক সরকার নয় বরং জনগণ, তাই সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বেশি জরুরি।

তাই কাসেম সাহেবের মতো সরকারকেও সচেষ্ট থাকতে হয়, খরচ মেটানোর জন্য দরকারি রাজস্ব সংগ্রহ হলো কি না, ঘাটতি সামাল দিতে পর্যাপ্ত ঋণ কোথা থেকে আসবে, সেই ঋণের উৎসও এমন হতে হবে, যাতে সুদের বাড়তি বোঝা না চাপে। খেয়াল রাখতে হয়, সেই টাকা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো বা নিরাপত্তার মতো জরুরি খাতগুলোতে—এমনভাবে খরচ হলো কি না, যাতে সবার প্রয়োজন মেটে। সতর্ক থাকতে হয়, দুর্নীতি বা অপচয়ে কোনো খাতে খরচের টাকা নষ্ট হলো কি না, যাতে সর্বোচ্চ ফল পাওয়া যায় বিনিয়োগ থেকে। কারণ তা না হলে গোটা দেশের অর্থনীতির জন্য বিপর্যয় নামতে পারে।

অর্থনীতির তত্ত্বেও সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনাকে একইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে তিনটি মানদণ্ডের কথা বলা আছে। যার ওপর নির্ভর করবে সরকার তার তহবিল ব্যবস্থাপনায় কতটা সফল বা ব্যর্থ হচ্ছে। এই তিনটি মানদণ্ড নিচে দেয়া হলো।

- **আর্থিক শৃঙ্খলা :** এর অর্থ হচ্ছে ভবিষ্যতের ওপর দায় না চাপিয়ে সীমিত সম্পদকে এমনভাবে ব্যবহার করা, যাতে বর্তমান সময়ের প্রয়োজন মেটানো যায়। সরকার তার খরচকে আয়ের সঙ্গে মিল রেখে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হলে অর্থনীতিতে বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের ঘাটতি দেখা দেয়, ঋণ ও সুদের দায় বাড়ে। ফলে সামষ্টিক অর্থনীতি ভারসাম্য হারায়। তাই ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে ব্যয় পরিকল্পনা প্রণয়নের দক্ষতাকে সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখা হয়।
- **বণ্টনে দক্ষতা :** দক্ষ পরিকল্পনা প্রণয়নের পর আসে সম্পদ বণ্টনের পালা। সরকার তার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোন খাতে কতটা বরাদ্দ দিচ্ছে, অগ্রাধিকারের সঙ্গে মিল রেখে এই বরাদ্দ হচ্ছে কি না, বরাদ্দ কোথায় বাড়াতে হবে, কোথায় কমাতে হবে, কখন কোথায় বিনিয়োগ করলে বেশি ফল পাওয়া যাবে, এ সবকিছুই নির্ভর করে সরকারের সম্পদ বণ্টনে দক্ষতার ওপর। তা না হলে অপচয় বাড়ে এবং বিনিয়োগ থেকে জনগণ দরকারি সুবিধা পায় না।
- **বাস্তবায়নে দক্ষতা :** এর অর্থ, সম্পদ এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে সর্বোচ্চ ফল পাওয়া যায়। এটি নির্ভর করে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সঠিকভাবে সম্পদ

ব্যবহারের যোগ্যতা, তার জনবল, বেতনকাঠামো এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ প্রাপ্তির ওপর। দক্ষতা না থাকলে, অপচয় ও দুর্নীতি বাড়ে।

একজন সংবাদকর্মীর জন্য এই তিনটি মানদণ্ড জানা খুবই জরুরি। বিষয়বস্তু পণ্য-সেবা-কাজ যা-ই হোক না কেন, এর ভিত্তিতেই তিনি নির্ধারণ করতে পারবেন, তহবিল ব্যবহারে সরকারের সার্থকতা বা দুর্বলতা কোথায়। অথবা সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনা নিয়ে সাংবাদিকতার জন্য বেশি মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন কোন জায়গায়।

বাংলাদেশের চিত্র

এবার দেখা যাক ওপরের মানদণ্ড অনুযায়ী সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ ঠিক কোন জায়গায় আছে। এই বিষয় নিয়ে ২০১০ সালে বহুজাতিক দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের সরকারি ব্যয় ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যালোচনা নামের একটি প্রতিবেদন বের করে। সেখানে বলা হয়, আর্থিক শৃঙ্খলা এবং অগ্রাধিকার অনুযায়ী সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বাস্তবায়নে দক্ষতা—এখনো সবচেয়ে দুর্বল জায়গা হয়েই রয়ে গেছে।

গেল প্রায় এক দশক ধরে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার গড়ে শতকরা ৬ ভাগ। দফায় দফায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর রাজনৈতিক অস্থিরতার পরও এই গতি বজায় আছে। জিডিপির অনুপাতে অনেক কম হলেও প্রতিবছরই রাজস্ব আদায় বাড়ছে। বড় হচ্ছে উন্নয়ন কর্মসূচি। তার পরও একটা লম্বা সময় ধরে বাজেট ঘাটতি শতকরা ৫ ভাগের নিচে। এই তথ্য প্রমাণ করে, নানান ঘাত-প্রতিঘাতের পরও দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়নি। বাংলাদেশ তার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আর্থিক শৃঙ্খলা ধরে রাখতে পেরেছে।

একই সময়ে সামাজিক খাতেও বাংলাদেশের অর্জন প্রতিবেশী অনেকের তুলনায় ঈর্ষা করার মতো। দারিদ্র্য বিমোচন এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বিভিন্ন সূচকে অগ্রগতি প্রমাণ করে বাংলাদেশে সম্পদের বণ্টন হয়েছে তার অগ্রাধিকারের সঙ্গে মিল রেখে। বিশ্বব্যাংকের সেই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাজেটে অগ্রাধিকার খাত অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ এই অর্জনের পেছনে বড় অবদান রেখেছে।

বাজেট প্রণয়ন ও সম্পদের বণ্টনক্ষমতা মূলত অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের হাতে। এই দুই জায়গায় দক্ষ জনবল আছে। তাই পরিকল্পনা ও বণ্টনে কিছু সাফল্য দেখা যায়। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের সময় বাস্তবায়নকারী সংস্থার তেমন দক্ষতা থাকে না। তাই বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ধীর গতিতে বাস্তবায়িত হয়, বরাদ্দের অনেকটাই অপচয় অথবা দুর্নীতির কারণে সঠিক জায়গায় পৌঁছায় না। মানুষও উন্নয়ন কর্মসূচির সুফল পায় না। বিশ্বব্যাংক এটিকে সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনায় সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে দেখিয়েছে। প্রশাসনে রাজনৈতিক নিয়োগ, কাজ বণ্টনে অনিয়ম, বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকারের দুর্বল ভূমিকা—এই সবকিছু সরকারি ব্যয়কাঠামোকে ভঙ্গুর করে তুলেছে।

ব্যয় ব্যবস্থাপনায় এই অদক্ষতা এবং কাঠামোগত দুর্বলতা দীর্ঘ মেয়াদে দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অর্জনগুলোকে আরো পেছনের দিকে ঠেলে দিতে পারে, এমন আশঙ্কার কথাও বলা হয়েছে সেই প্রতিবেদনে।

- **তহবিল ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায় :** দেশে সরকারি অর্থ-ব্যবস্থাপনার জন্য মূল আইনি কাঠামো গড়ে দিয়েছে সংবিধানের ৮১ থেকে ৯২ অনুচ্ছেদ। যেখানে বাজেট তৈরির সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়কে। তবে জনগণের দেয়া এই টাকা সরকার তার ইচ্ছামতো খরচ করতে পারে না। এজন্য তাকে সংসদের অনুমোদন নিতে হয়। প্রতিবছর সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা করে অর্থ মন্ত্রণালয় আয় ও ব্যয়ের একটি রূপরেখা তুলে ধরে। অর্থ বিল এবং নির্দিষ্টকরণ আইন আকারে সেটি পাস হয়। এই দুটি আইনের মাধ্যমে সরকারকে ক্ষমতা দেয়া হয়, জনগণের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ এবং জনগণের কল্যাণে সেই টাকা খরচের। জেনে রাখা ভালো, এই আইনের বাইরে সরকার এক টাকাও খরচ করতে পারে না, তেমনি কারো ওপর নতুন করও আরোপ করতে পারে না। পরিকল্পনার চেয়ে কম বা বেশি খরচ হলে তাও সরকারকে বছর শেষ হবার আগে সংশোধিত বাজেটের মাধ্যমে সংসদ থেকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়।

চিত্র : সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনার পর্যায়

বাজেট চক্রটির ছবিটি দেখলে সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনার চারটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

১. নীতি ও পরিকল্পনা পর্যায়

২. বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন পর্যায়

৩. বাস্তবায়ন পর্যায়

৪. নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন পর্যায়

সাধারণভাবে বাজেটকে শুধু আয় বা ব্যয় দিয়ে বিচার করা হলেও পরিকল্পনা ও নিরীক্ষা ছাড়া গোটা প্রক্রিয়াই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বাজেটকে ভালোভাবে বুঝতে অর্থ মন্ত্রণালয় প্রতিবছর একটি পাঠ-সহায়িকা তৈরি করে। অর্থ-ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে বিশদ বিবরণ সেখানে তুলে ধরা হয়।

১ নীতি ও পরিকল্পনা : বাজেটের প্রথম ধাপই হলো পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ন। এর মধ্য দিয়ে বাজেট চক্র শুরু। প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের কিছু উদ্দেশ্য থাকে। জনগণকে দেয়া অঙ্গীকারগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন সেই সব উদ্দেশ্য অর্জনের ওপর নির্ভর করে। এজন্য সরকারি দপ্তরগুলোর স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশল থাকে। এই কৌশলের সঙ্গে মিল রেখে কী কী কাজ করতে হবে, তাঁর একটি সময়ভিত্তিক রূপরেখা তাঁরা তৈরি করেন। এটাই মূলত পরিকল্পনা। এটি তৈরির সময় তারা দেখেন, যে কাজ করা হবে সেখান থেকে কী ফল পাওয়া যাবে এবং নির্দিষ্ট ফল পেতে কী ধরনের বিনিয়োগ বা সময় লাগবে। এই পরিকল্পনা তৈরির জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

২ বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন : মধ্যমেয়াদি বাজেট-কাঠামোর আওতায় বাজেট প্রণয়ন মূলত তিনটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। কৌশলগত পর্যায়, প্রাক্কলন পর্যায় এবং বাজেট অনুমোদন পর্যায়। কৌশলগত পর্যায়ে মন্ত্রণালয় বা বিভাগ এবং তাদের অধীন দপ্তরগুলো সবার আগে বিদ্যমান নীতি-কৌশল, অগ্রাধিকার, পূর্বের অর্জন এবং প্রাপ্য সম্পদের অবস্থা পর্যালোচনা করে। এর ভিত্তিতে তাদের নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের বাজেট-কাঠামো হালনাগাদ করতে হয়।

প্রাক্কলন পর্যায়ে মন্ত্রণালয় বা বিভাগকে এক বছর মেয়াদি বাজেটের সম্ভাব্য হিসাবে তৈরি করতে হয়। সঙ্গে পরবর্তী দুই বছরের জন্য বছরভিত্তিক বাজেট কত হতে পারে সেই প্রক্ষেপণও দিতে হয়। এ ক্ষেত্রে মোট রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয়কে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বেঁধে দেয়া সীমার মধ্যেই রাখতে হয়।

এরপর একে একে সব দপ্তর তাদের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ পাঠান অর্থ বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনে। তারা সরকারের নীতি, অগ্রাধিকার ও ব্যয়সীমার সঙ্গে মিল রেখে রাজস্ব এবং উন্নয়ন ব্যয়ের চূড়ান্ত প্রাক্কলন তৈরি করেন। এই হিসাব তৈরি হয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে, সর্বসম্মতভাবে।

এসব প্রাক্কলনকে সমন্বিত করে অর্থ বিভাগ মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করে। মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের পর মাননীয় অর্থমন্ত্রী মধ্যমেয়াদি বাজেট-কাঠামোসহ বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি (বাজেট) আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করেন।

৩ বাজেট বাস্তবায়ন : সংসদে বাজেট পাস হবার পর থেকে শুরু হয় বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া। এরও কয়েকটি ধাপ আছে।

ক. বাজেট মঞ্জুরি অবহিতকরণ ও বন্টন : অনুমোদিত বাজেট জুলাই মাসে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে জানানো হয়। তারপর মন্ত্রণালয় বা বিভাগ অধীনস্থ দপ্তরগুলোকে তাদের জন্য নির্দিষ্ট বরাদ্দ সম্পর্কে অবহিত করে।

খ. অর্থ ছাড় : বাজেটে কোন কাজের জন্য কত টাকা রাখা হয়েছে তার সঙ্গে সংগতি রেখে অর্থ ছাড় করা হয়। সাধারণত মন্ত্রণালয় বা বিভাগ প্রথম তিন কিস্তির টাকা অবমুক্ত করতে পারে। চতুর্থ কিস্তির টাকা ছাড়ের জন্য অর্থ বিভাগ এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনের পূর্বানুমোদন লাগে।

গ. ব্যয় নিয়ন্ত্রণ : ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মন্ত্রণালয় বা বিভাগের মোট খরচকে অনুমোদিত বরাদ্দের মধ্যে সীমিত রাখা। একই সঙ্গে, বরাদ্দের টাকা যেন জনস্বার্থে এবং উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিল রেখে খরচ হয়, তা নিশ্চিত করা। প্রাথমিকভাবে মন্ত্রণালয়ের মুখ্য হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা ব্যয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

ঘ. পুনঃ উপযোজন : বাজেটে বরাদ্দগুলো থাকে খাতওয়ারি। অনেক সময় দেখা যায়, কোনো একটি নির্দিষ্ট খাত তার জন্য বরাদ্দ টাকা খরচ করতে পারছে না। আবার অনেক খাত আছে তারা টাকার অভাবে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ করতে পারছে না। এ অবস্থায় নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে, এক খাতের টাকা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে অন্য খাতে সরিয়ে নেয়া যায়। একেই পুনঃ উপযোজন বলে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া পুনঃ উপযোজন করা যায় না।

ঙ. অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ : বাজেটের সব টাকা সরকার কখনোই খরচ করতে পারে না। প্রকল্পের কাজে ধীরগতি, সরকারের মিতব্যয়িতার কারণে খরচ কমে যাওয়া অথবা কোনো কোনো সময় দরকারের চেয়ে বেশি প্রাক্কলন করার কারণে কিছু টাকা রয়ে যেতে পারে। নিয়মানুযায়ী এই টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হয় অর্থবছর শেষ (৩০ জুন) হওয়ার আগেই। ভবিষ্যতের কোনো খরচ মেটানোর জন্য সরকারি খাতের অব্যয়িত অর্থ ধরে রাখা যায় না।

৪ পরিবীক্ষণ, নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন : সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সরকারের দুই ধরনের নজরদারির ব্যবস্থা আছে। প্রথমত, বাজেট বাস্তবায়নের সময়ে বিভিন্ন কাজ পরিবীক্ষণ। আরেকটি হলো, অর্থবছর শেষে সরকারের খরচ নিরীক্ষা। এর মধ্য দিয়ে তিনটি বিষয় নিশ্চিত হওয়া যায়।

- প্রাক্কলন অনুযায়ী আয় হচ্ছে কি না
- মঞ্জুরি অনুযায়ী খরচ হচ্ছে কি না
- যে উদ্দেশ্যে বরাদ্দ, সে উদ্দেশ্যে অথবা বরাদ্দ নেই এমন খাতে ব্যয় হচ্ছে কি না

পরিবীক্ষণের মাধ্যমে ব্যয়ের সঙ্গে সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতি বিধানের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ অনুসারে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয়ের গতিধারা পর্যালোচনা করে অগ্রগতির প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করতে হয়। এ আইন অনুযায়ী সব মন্ত্রণালয় তাদের আর্থিক, আর্থিক নয়—এমন সব ধরনের কাজ সম্পাদনের ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে বাধ্য। পাঁচটি মন্ত্রণালয় প্রাথমিক পর্যায়ে এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করছে।

সব মন্ত্রণালয়ই অর্থবছরের শুরুতে বাজেট কীভাবে বাস্তবায়ন করবে, তার একটি পরিকল্পনা অর্থ বিভাগে পাঠায়। এ ছাড়া পর্যালোচনা, নগদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সঙ্গে সমন্বয় এবং জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের জন্য তাদের ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে জমা দিতে হয়।

অথর্বছর শেষে সরকারি ব্যয় নিরীক্ষার কাজ শুরু হয়। এই কাজ করে থাকেন বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক। বিশেষ করে সরকারি দপ্তর, সংস্থা এবং বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে ব্যয়ের ক্ষেত্রে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে কি না, তা নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে। সরকারি ব্যয় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে কি না এবং বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলো দক্ষতার সঙ্গে ব্যয় করতে পেরেছে কি না, তা নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়।

জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সরকারি অর্থ যথাযথ ব্যয়ের বিষয়ে নজরদারির ভূমিকা পালন করে। এ ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করার বিষয়েও কমিটি দরকারি দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে। অডিট থেকে কোথাও কোনো বড় আর্থিক অনিয়ম পেলে, কমিটি সেই আপত্তির ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে টাকা সমন্বয় করার নির্দেশ দেয়। কোনো প্রকল্পে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি না হলে অনেক সময় পরের অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

তৃতীয় অধ্যায়

বাজেট ও প্রতিবেদনের সম্ভাব্য ক্ষেত্র

সরকারের তহবিল ব্যবস্থাপনার সবকিছুই মূলত বাজেটকে ঘিরে। তাই এই বিষয়ে রিপোর্টিংয়ের জন্য সবার আগে বাজেট বুঝতে হবে। যেহেতু সরকারি অর্থের মালিক আসলে জনগণ, তাই সরকারি অর্থ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তারা কীভাবে সর্বোচ্চ সুবিধা পেতে পারে, সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই দলিল প্রতিটি নাগরিককে কোনো-না-কোনোভাবে প্রভাবিত করে। তাই এর গুরুত্ব পুরোপুরি উপলব্ধির জন্য জাতীয় বাজেট কী, এর রূপরেখা কেমন, কোথা থেকে টাকা আসে, কোথায়, কীভাবে তা খরচ করা হয়, কেন ঘাটতি হয়, কীভাবে তা মেটানো হয়—এসব বিষয় অবশ্যই জানতে হবে।

মোটা দাগে সরকার প্রতি অর্থবছরে তার আয় ও ব্যয়ের যে হিসাব বিবরণী তৈরি করে তা-ই জাতীয় বাজেট। এর চারটি অংশ।

১. প্রাপ্তি বা আয়

২. ব্যয়

৩. বাজেট ঘাটতি

৪. ঘাটতি অর্থায়ন

১. আয়ের উৎস

সরকার মূলত দুই ধরনের উৎস থেকে টাকা সংগ্রহ করে। কর থেকে আয় এবং কর ছাড়া অন্য আয়। করই আয়ের সবচেয়ে বড় জায়গা। এর মধ্যে রয়েছে : ব্যক্তির আয় বা কোম্পানির মুনাফার ওপর কর, আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট), ভূমি উন্নয়ন কর, যানবাহনের ওপর কর, স্ট্যাম্প ডিউটি ইত্যাদি। কর ছাড়া আয়ের অন্য উৎস হলো প্রশাসনিক ফি, সরকারি মালিকানার প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে আসা লভ্যাংশ ও মুনাফা,

সরকারি আয় নিয়ে রিপোর্টিংয়ের সম্ভাব্য ক্ষেত্র

- রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা, আদায়ের চিত্র, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় এর প্রভাব
- কর, শুল্ক বা ভ্যাট ফাঁকি
- রাজস্ব আদায় বাড়াতে গিয়ে হয়রানি, চাপ, কর্মকর্তাদের দুর্নীতি
- সরকারি মালিকানার প্রতিষ্ঠানে লোকসান
- অদক্ষতার কারণে উৎপাদনক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার না করতে পারা
- লাভজনক প্রতিষ্ঠানের মুনাফা কোষাগারে জমা না রাখা
- মুনাফার টাকা সরকারি ব্যাংকে নির্দিষ্ট পরিমাণে রাখার নিয়ম ভেঙে বেশিরভাগ টাকা বেসরকারি ব্যাংকে রাখা
- সরকারি ও বেসরকারি সেবার মধ্যে মান ও আয়ের তুলনা

জরিমানা, বাজেয়াপ্তকরণ, সুদ, ভাড়া ও ইজারা, টোল ও লেভি ইত্যাদি। এ ছাড়াও রয়েছে রেলপথ, ডাক বিভাগের মতো সরকারি সেবা থেকে হওয়া আয়।

২. ব্যয়ের খাত

সরকারি তহবিল মূলত দুটি খাতে খরচ হয়। রাজস্ব ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয়।

ক. রাজস্ব ব্যয় : সরকার জনসাধারণকে যেসব সেবা দিয়ে থাকে তা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ব্যবহৃত অর্থই রাজস্ব ব্যয়। এ ব্যয় নৈমিত্তিক ধরনের হয়ে থাকে। প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, ভর্তুকি, সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, সরবরাহ ও সেবা রাজস্ব ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়াও, সামাজিক নিরাপত্তা বাবদ ব্যয়, সুদ পরিশোধও রাজস্ব ব্যয়।

খ. উন্নয়ন ব্যয় : সরকারি বিনিয়োগধর্মী প্রকল্প, বিশেষ করে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (যেমন : সড়ক, সেতু, রেল, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি) মানবসম্পদ উন্নয়ন (যেমন : শিক্ষা ও স্বাস্থ্য) এবং কৃষি উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থ উন্নয়ন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) নির্দিষ্ট একটি অর্থবছরে বিভিন্ন খাতে প্রকল্পভিত্তিক উন্নয়ন ব্যয় পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ থাকে।

সরকারি ব্যয় নিয়ে রিপোর্টিংয়ের সম্ভাব্য ক্ষেত্র

- ভর্তুকির ব্যবহার
- সামাজিক নিরাপত্তা বরাদ্দ নিয়ে অনিয়ম, দুর্নীতি
- সরকারি ক্রয়ে দুর্নীতি
- অদক্ষতার কারণে অপচয়
- লোকসানি সরকারি প্রতিষ্ঠানে উৎসাহ ভাতার ছড়াছড়ি
- প্রকল্প বাস্তবায়নে অগ্রগতি, চুক্তি ইত্যাদি
- সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য
- গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সিদ্ধান্ত
- দুর্নীতির কারণে সরকারি ব্যাংকে লোকসান, পুনঃঅর্থায়ন

৩. ঘাটতি ও অর্থায়ন

প্রাপ্তির চেয়ে সরকারের ব্যয় বেশি হলে ঘাটতির সৃষ্টি হয়। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে একজন ব্যক্তিকে যেমন ঋণ নিতে হয়, সরকারের ক্ষেত্রেও তাই। সরকারও ঘাটতি মেটায় বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ নিয়ে। তবে সরকার কতটুকু ঋণ নেবে তার জন্য পরিকল্পনা করতে হয়। তা না হলে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ভারসাম্যহীনতার ঝুঁকি বাড়ে।

বাংলাদেশের বাজেটে বিদেশি অনুদানকে রাজস্ব প্রাপ্তির সঙ্গে যোগ করা হয়। এটি যেহেতু ঋণ নয়, তাই ফেরত দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এই বিবেচনায় এটি রাজস্ব প্রাপ্তি। তবে বাজেট দলিলে অনুদানসহ ও অনুদান ছাড়া দুভাবেই ঘাটতি দেখানো হয়।

সরকার মূলত দুভাবে ঘাটতি অর্থায়ন করে। একটি হলো অভ্যন্তরীণ এবং অন্যটি বৈদেশিক। অভ্যন্তরীণ ঋণের উৎস আবার দুই ধরনের, ব্যাংক এবং ব্যাংকবহির্ভূত। ব্যাংকবহির্ভূত ঋণ মূলত নেয়া হয় জাতীয় সঞ্চয় স্কিম, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং সমজাতীয় অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে। বৈদেশিক ঋণ থেকে অর্থের সংস্থান আসে প্রকল্প সাহায্য, বাজেট সহায়তা এবং অনুদান ও ঋণ আকারে।

ঘাটতি অর্থায়ন নিয়ে রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্র

- বিদেশি সাহায্য : প্রবাহ ও ব্যবহার
- সরকারের ব্যাংক ঋণ : মাত্রা ও প্রভাব
- সঞ্চয়পত্র : বেচাকেনা ও সুদের হার
- ঘাটতি : বাড়ে যাওয়া বা কমা
- কম সুদের ঋণের পরিবর্তে বেশি সুদে ঋণ নেয়া
- ঋণ ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়
- ঋণ চুক্তি বাতিল
- দাতাদের শর্ত, মতামত, পর্যালোচনা

৪. প্রতিবেদনের ক্ষেত্র

বাজেটের প্রতিটি ধাপই সাংবাদিকতার একেকটি ক্ষেত্র। ধরা যাক, অর্থায়ন বা আয়-ব্যবস্থাপনার কথা। স্বাভাবিকভাবেই, রাজস্ব হলো সরকারের আয়ের সবচেয়ে বড় ও ভালো উৎস। কারণ, এই টাকা ফেরত দিতে হয় না। এরপরই বিদেশি সহায়তা। কারণ এ ধরনের ঋণ ফেরত দেয়ার জন্য প্রচুর সময় পাওয়া যায়। সুদের হার থাকে খুবই কম। সেই বিচারে সবচেয়ে ব্যয়বহুল উৎস হলো অভ্যন্তরীণ বা ব্যাংক-ব্যবস্থা থেকে ঋণ। কারণ এ ধরনের উৎসে সুদের হার খুবই চড়া। তাই উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার কোন উৎস থেকে টাকা নিচ্ছে, এটাও প্রতিবেদনের বড় বিষয় হতে পারে।

সরকারের খরচের সবচেয়ে বড় খাত স্বাস্থ্য, শিক্ষা বা অবকাঠামো নয়; বরং ঋণের সুদ পরিশোধ। অভ্যন্তরীণ ঋণ গ্রহণ যত বাড়ছে, অর্থনীতিতে সুদের দায়ও তত বড় হচ্ছে। এর ফলে সামাজিক ও উন্নয়ন ব্যয়ে আরো বেশি অর্থের জোগান দেয়ার সুযোগও সংকুচিত হয়ে আসছে। এসব বিষয় সামনের দিনগুলোতে সামষ্টিক অর্থনীতি নিয়ে প্রতিবেদন তৈরির বড় জায়গা হয়ে দেখা দিতে পারে।

সামনে সরকার বন্ড ছেড়ে বিদেশ থেকে তহবিল সংগ্রহ করতে যাচ্ছে। এই বন্ডে বিনিয়োগকারীদের নির্দিষ্ট হারে সুদ দিতে হবে সরকারকে। বিশ্ব অর্থবাজার প্রতিনিয়তই ওঠানামা করে। এখানে সম্ভাবনা যেমন আছে, তেমনি ঝুঁকিও অনেক। এই বন্ড বাজারে স্পেকুলেশন বা ফাটকাবাজারির ফাঁদে পড়ে একসময় গোটা গ্রিস রাষ্ট্রকে দেউলিয়া হতে হয়েছে। তাই অর্থায়নের এই উৎসটিও সম্ভাব্য অনেক খবরের ক্ষেত্র হতে পারে।

অনেক সময় সুদের দায় অথবা অভ্যন্তরীণ ঋণ কমাতে সরকার নানা ধরনের ব্যবস্থা নেয়। এর একটি হলো, সঞ্চয়পত্রের সুদহার কমিয়ে দেয়া। সরকার সঞ্চয়পত্র ছেড়ে মানুষের কাছ থেকে টাকা নেয়। এখানে সুদ হার কমালে মানুষ সঞ্চয়পত্র কেনা কমিয়ে দেয়। এটি ঋণ নিয়ন্ত্রণের একটি কৌশল। কখনো কখনো এ ধরনের স্কিমে ভালো মুনাফার প্রতিশ্রুতি পেয়ে অনেকেই সেখানে বিনিয়োগ করেন। কিন্তু বছরের মাঝামাঝি বা কোনো পর্যায়ে সরকার সুদ কমিয়ে দিলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হন। এর উল্টোটাও আছে। সরকার ব্যাংক থেকে বেশি হারে ঋণ নিলে অথবা সঞ্চয়পত্রের সুদহার বাড়িয়ে দিলে, বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য টাকার জোগান সংকুচিত হয়। এভাবে পরিবর্তনশীল জাতীয় ও বিশ্ব অর্থনীতির অনেক উপাদান, তাদের মধ্যে আন্তসম্পর্ক সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনার অংশ হয়ে দাঁড়ায়, যা নতুন নতুন খবরেরও জন্ম দেয়।

চতুর্থ অধ্যায়

ব্যয় ব্যবস্থাপনায় যত দুর্নীতি

কেনাকাটায় দুর্নীতি-অনিয়ম

সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে বড় অংশই হচ্ছে কেনাকাটা। বাংলাদেশে উন্নয়ন বাজেটের শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ ভাগই ক্রয় বাবদ খরচ হয়, যা দিয়ে সরকার নির্মাণ থেকে শুরু করে পণ্য বা সেবা কেনার মতো কাজ করে থাকে। সরকারি কেনাকাটার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো টেন্ডার বা দরপত্র। সাধারণত কিছু কেনা বা কোনো কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের আগে সরকারকে দরপত্র আহ্বান করতে হয়। সেখানে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে সর্বনিম্ন দরদাতা বা কারিগরি এবং আর্থিক প্রস্তাবের দিক দিয়ে সবচেয়ে যোগ্য প্রতিষ্ঠান কাজ পেয়ে থাকেন। কিন্তু ঘুষ, জালিয়াতি, কারসাজি, রাজনৈতিক প্রভাব ও স্বজনপ্রীতির কারণে এই প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে প্রতিযোগিতার সুযোগ নষ্ট হয় এবং ঠিকাদার ও সরকারি কর্মকর্তাদের যোগসাজশে বেশি দর দিয়েও অযোগ্য প্রতিষ্ঠান কাজ পেয়ে যায়। এর ফলে সরকারি অর্থের যেমন অপচয় হয়, তেমনি কাজও হয় নিম্নমানের। জনগণের টাকা চলে যায় মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের পকেটে। দেশ বঞ্চিত হয় কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন থেকে। তাই সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রতিবেদন তৈরির আগে সরকারি ক্রয়ে কতভাবে দুর্নীতি হয়, কারা কীভাবে এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকে, নির্দিষ্ট দুর্নীতির ধরনই বা কেমন—এসব বিষয় জানা জরুরি।

১. ঘুষ বা উৎকোচ : এটি দুর্নীতির সবচেয়ে পরিচিত ধরন। ঘুষ হলো কাজ পাইয়ে দেয়া বা কাজসংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করতে কাউকে মূল্যবান কোনো কিছু দেয়া কিংবা কারো কাছ থেকে তেমন কিছু নেয়া। এই মূল্যবান কিছু হতে পারে নগদ টাকা, দামি উপহার, ঋণ, নির্দিষ্ট জায়গা থেকে প্রকৃত দামের চেয়ে অনেক বেশিতে কিছু কেনা, ফি বা কমিশন, ব্যবসায় গোপন অংশীদারিত্ব, এমনকি ভোগবিলাসের উপকরণও। সাধারণত বড় বড় প্রকল্পে কাজ পেতে ঠিকাদাররা ৫ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত ঘুষ দিয়ে থাকেন বলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণায় দেখা যায়।

কখন বুঝবেন কোনো কাজে ঘুষ লেনদেনের ঘটনা ঘটেছে? যখন দেখা যাবে, কেনাকাটার সঙ্গে জড়িত সরকারি কর্মকর্তা অল্প সময়ের মধ্যে অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছেন অথবা তিনি দামি উপহার নিয়েছেন। অনুপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেয়া, সিদ্ধান্তের সময় সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতি পক্ষপাত দেখানো, বেশি দাম সত্ত্বেও কেনাকাটার অনুমোদন দেয়া, তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পণ্য নেয়া অথবা বারবার নিম্নমানের পণ্য গছিয়েও পার পেয়ে যাওয়া—এগুলোকেই সম্ভাব্য ঘুষ লেনদেনের চিহ্ন হিসেবে দেখা হয়।

২. আঁতাত বা যোগসাজশ : সরকারি কেনাকাটায় ঠিকাদারদের মধ্যে আঁতাত বা যোগসাজশের প্রবণতা অনেক পুরোনো এবং প্রচলিত। এ ক্ষেত্রে কিছু ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এক হয়ে এমনভাবে দর প্রভাবিত করে, যাতে একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানই কাজ পায়। এভাবে একেক দফায় একেক রকম দর দিয়ে তারা নিজেরাই প্রভাবিত দরে কাজ ভাগাভাগি করে নেয়, যাতে বাইরের কেউ এর থেকে কম দরে কাজ না পায়। অথবা তারা একত্রিত হয়ে একটি কাজকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করে নিজেদের মধ্যেই তা বাটোয়ারা করে নেয়। সাধারণত, রাস্তাঘাট নির্মাণের বেলায় এমন প্রবণতা বেশি দেখা যায়। বাংলাদেশে এ ধরনের ঘটনা অহরহই ঘটছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘুষের বিনিময়ে সরকারি কর্মকর্তারাও এই আঁতাতে যোগ দেন এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের কাজ পাইয়ে দিতে সাহায্য করেন।

আঁতাত বা যোগসাজশের কারণে সরকারি কেনাকাটায় প্রতিযোগিতার যে মূলনীতি তা-ই নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে ঠিকাদাররা প্রকৃত খরচের চেয়ে অনেক বাড়তি দাম দেখিয়েও কাজ পেয়ে যান; ফলে প্রকল্পের খরচ বেড়ে যায়, শেষ পর্যন্ত যা সরকারি টাকার অপচয় বা লুটপাটের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কখন বুঝবেন কোনো কাজের ক্ষেত্রে ঠিকাদারদের মধ্যে আঁতাত হয়েছে? যখন দেখবেন, প্রাক্কলিত হিসাব বা মূল্যতালিকা বা একই ধরনের অন্য কাজের চেয়ে কোনো নির্দিষ্ট কাজ অনেক বেশি দর দিয়েও কেউ পেয়ে যাচ্ছে; একটি নির্দিষ্ট এলাকায় একটি নির্দিষ্ট ধরনের কাজ ঘুরেফিরে একই প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হচ্ছে। দরপত্রে হেরে যাওয়া প্রতিষ্ঠানকে সাবকন্ট্রাক্ট দিয়ে কার্যাদেশ পাওয়া ঠিকাদার তার পক্ষে কাজ করিয়ে নিচ্ছে, অথবা অংশ নেয়া ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম আলাদা হলেও তাদের জমা দেয়া দলিলে একই ঠিকানা ফোন নম্বর বা ব্যক্তির নাম ব্যবহার করা হয়েছে। বেশিরভাগ সময় দেখা যায়, বিডিংয়ে অংশ নেয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক প্রস্তাবে সংখ্যাগুলো খুব কাছাকাছি হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একই সংখ্যা রেখে কয়েকটি সংখ্যা মাত্র বদলে দিয়ে মোট দরের সামান্য হেরফের করা হয় অথবা প্রথম নিম্ন দরের সঙ্গে দ্বিতীয় দরের বেশ বড় আকারের পার্থক্য রাখা হয়, যাতে একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানই কাজ পায়।

অনেক সময় একজন ঠিকাদার বেনামে অথবা একাধিক অস্তিত্বহীন কোম্পানির নামে দর-প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন। ক্রয় কর্মকর্তার যোগসাজশে ভুয়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ঠিকাদার বা চক্র বারবার কাজ পেয়ে থাকে।

শুধু ঠিকাদার নন, ক্রয় কর্মকর্তারাও অনেক সময় যোগসাজশে জড়িয়ে পড়েন। তাঁরা নির্দিষ্ট ঠিকাদারকে কাজ পাইয়ে দিতে কখনো পণ্যের এমন স্পেসিফিকেশন তৈরি করেন, যা শুধু

একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সরবরাহ করা সম্ভব অথবা প্রাক-যাচাইয়ের জন্য এমন শর্ত জুড়ে দেন, যাতে যোগ্য অনেক প্রতিষ্ঠান বাদ পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা কাজকে এমনভাবে বিভাজিত করেন, যাতে প্রতিযোগিতামূলক দর-প্রক্রিয়া এড়িয়ে এককভাবে পছন্দের প্রতিষ্ঠানকে নিম্ন স্তরের অনুমোদনকারীর অনুমোদন নিয়ে ক্রয় আদেশ দেয়া যায়। এ ক্ষেত্রে দেখা যায়, অস্বাভাবিক শর্তের কারণে অনেক প্রতিষ্ঠান দর-প্রস্তাবে অংশ নিতে ব্যর্থ হয়; কাজের বা পণ্যের বিবরণ হয় খুবই সংকীর্ণ, কখনো কখনো বিডিংয়ে অংশ নেয়ার জন্যও খুব সংক্ষিপ্ত সময় দেয়া হয় এবং ক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ সীমিত করা হয়, যাতে সব প্রতিষ্ঠান না জানতে পারে।

৩. ক্রয় আদেশ বিভাজন : প্রত্যেক দেশেই সরকারি টাকা খরচের ক্ষমতা ভাগ করা থাকে। সরকারের কোন পর্যায়ের ব্যক্তি কত টাকা পর্যন্ত ক্রয় আদেশ অনুমোদন করতে পারবেন, তার সীমাও বেঁধে দেয়া আছে। আবার কত টাকার কাজ হলে তা উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক দর-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে, টাকার অঙ্ক কত হলে সীমিত আকারে দরপত্র ডেকেই কাজ দেয়া যাবে, তাও আইনে বলা আছে। এই সীমাকে পাশ কাটিয়ে প্রতিযোগিতা ছাড়াই বিশেষ প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেয়ার একটি উপায় হলো বিভাজন। এ ক্ষেত্রে ক্রয়প্রতিষ্ঠান বড় আকারের কাজকে এমনভাবে ছোট ছোট লটে বিভক্ত করে, যাতে আঁতাতের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা নিজেই ক্রয় আদেশ অনুমোদন দিতে পারেন অথবা প্রতিযোগিতামূলক টেন্ডার ছাড়াই কাজ বণ্টন করতে পারেন। বিভাজন সরকারি কেনাকাটায় দুর্নীতির বড় চিহ্ন হিসেবে বিবেচিত।

৪. জালিয়াতি : সরকারি কেনাকাটায় জালিয়াতি নানা উপায়ে ঘটতে পারে এবং তা অহরহই ঘটে। সাধারণভাবে এ ক্ষেত্রে সরবরাহকারী কিংবা ঠিকাদার কাজ না করেই অথবা দরপত্র অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ না করেই ভুয়া চালান বা রসিদ জমা দিয়ে টাকা তুলে নেন। ঠিকাদার একাই এ ধরনের অপরাধ করতে পারেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা তার সঙ্গে জড়িত থাকেন।

জালিয়াতির বেলায় সাধারণত ঠিকাদাররা অপ্রতুল, নকল অথবা ঘষামাজা করা কাগজপত্র (রিসিট, ভাউচার, ইনভয়েস) জমা দেন। ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে পণ্য বা কাজ বুঝে নেয়ার প্রক্রিয়া দুর্বল হলে এ ধরনের ঘটনা বেশি ঘটে।

জালিয়াতি চেনার কয়েকটি উপায় আছে। ভুয়া চালানের বেলায় দেখা যায়, চালানপত্রের সঙ্গে গুদামে রাখা পণ্যের ধরন বা পরিমাণে মিল নেই, চালান অনুযায়ী পণ্য বা সেবা বুঝে নেয়ার কোনো দালিলিক প্রমাণ নেই অথবা যেসব পণ্য বা সেবা চালানে রয়েছে ক্রয় আদেশে তার কথাই লেখা নেই।

কোনো কোনো সময় পণ্যের তালিকা সঠিক হলেও সেখানে দাম বাড়িয়ে লেখা হয়। এ ধরনের ঘটনায় দেখা যায়, চালানে লেখা পণ্যের দাম, মোট টাকার পরিমাণ বা বিবরণের সঙ্গে ঠিকাদারের চুক্তি, ক্রয় আদেশ, পণ্য বুঝে নেয়ার রেকর্ড বই বা গুদামের হিসেবে কোনো মিল নেই।

অনেক সময় দেখা যায়, ক্রয় আদেশ অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ বা কাজ করা হয়েছে এক বার, কিন্তু তার জন্য ইনভয়েস বা চালান জমা দেয়া হয়েছে একাধিক। এভাবে ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকৃত অঙ্কের চেয়ে বেশি টাকা তুলে নেয়া হয়। ঠিকাদারের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তারাও জেনেশুনে এই খরচ অনুমোদন করেন। এমন ঘটনায় সাধারণত, জমা দেয়া ইনভয়েসগুলোতে পণ্যের বিবরণ, টাকার অঙ্ক, ইনভয়েস নম্বর এবং ক্রয় আদেশ নম্বর হুবহু একই থাকে।

এ ছাড়াও দেখা যায়, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান তাদের দর-প্রস্তাবে নিজস্ব কর্মকর্তাদের যে পরিচিতি দেয় তাতে অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ভুল বা অতিরঞ্জিত তথ্য থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তিরও নাম দেয়া হয়, যার সঙ্গে ঐ প্রতিষ্ঠানের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও এমন সব কাজের কথা বলা হয়, যা তারা করেননি।

যখন দলিলপত্রের সঙ্গে পরীক্ষা বা পরিদর্শনের ফলাফলে গরমিল ধরা পড়ে, যখন ঠিকাদারের দেয়া তথ্য যাচাই করতে বারবার উপযুক্ত প্রমাণ চেয়েও তা পাওয়া যায় না অথবা প্রমাণ হিসেবে দেয়া কাগজপত্রে ঘষামাজা থাকে, তখনই সম্ভাব্য জালিয়াতির বিষয়ে সতর্ক হতে হবে।

আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করার পর শর্তে পরিবর্তন

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কন্টেনার টার্মিনাল (এনসিটি) পরিচালনার দায়িত্ব একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানকে দেয়ার জন্য টেন্ডার ডকুমেন্টে পরিবর্তনসহ নানা উদ্যোগ নেয়ার অভিযোগ উঠেছে।

৮৭ পৃষ্ঠার ডকুমেন্টে ২২ হাজার ২৬৭ শব্দ রয়েছে। এই বিপুল শব্দভাণ্ডার থেকে মাত্র দুটি 'সিলড' শব্দ বাদ দেয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, এই একটি মাত্র শব্দ 'সিলড' বাদ দেয়ায় ফলে দরদাতাদের কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব বাঁধাই না করে এক খামে জমা দিতে হবে। এতে করে আলাদা আলাদা মূল্যায়নের পরিবর্তে একই সাথে দুটি প্রস্তাব মূল্যায়িত হবে। অথচ 'সিলড' শব্দটি থাকলে দুইটি প্রস্তাব আলাদাভাবে পরীক্ষা করা হতো।

এতে যাদের কারিগরি যোগ্যতা রয়েছে কেবল তাদের আর্থিক প্রস্তাব বিবেচনা করা হতো। এখন তা না করার ফলে কারিগরিভাবে যোগ্যতা নেই অথচ আর্থিক প্রস্তাব দিয়ে টেন্ডার ভাগিয়ে নেয়ার একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। .....

উদাহরণ : দরপত্রের শর্ত পরিবর্তনের মাধ্যমে অনিয়মসংক্রান্ত প্রতিবেদন

ক্রয় আদেশ পরিবর্তন

৫. ক্রয় আদেশ পরিবর্তন : অনেক সময় ক্রয়-প্রক্রিয়া বা প্রকল্প বাস্তবায়নের মাঝপথে নতুন উপকরণ সংযোজন-বিয়োজন, দাম সমন্বয়, কোনো কিছু কেনার আদেশ বাতিলসহ নানা কারণে ক্রয় আদেশ পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ে। এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এ ক্ষেত্রে চুক্তি ব্যয় সামান্য বাড়লে বা কমলেও ক্রয়কারী

প্রতিষ্ঠান বা অনুমোদনকারী তা অনুমোদন করেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগসাজশে মাঝপথে ক্রয় আদেশ পরিবর্তনের সুযোগকে অপব্যবহার করে প্রকল্পের খরচ, পরিধি বা সরবরাহ করা হবে এমন পণ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে নেন ঠিকাদাররা।

এমনও দেখা যায়, কাজ পেতে উপকরণের দাম কম দেখিয়ে কোনো প্রতিষ্ঠান অস্বাভাবিক রকম নিম্ন দর প্রস্তাব করে। কাজ পাওয়ার পর ক্রয় আদেশে পরিবর্তন আনা হয়। তখন সেই সব উপকরণের দাম স্বাভাবিকের চেয়েও অনেক বাড়িয়ে দেখানো হয়। এভাবে ঠিকাদার তাঁর মুনাফা বাড়িয়ে নেন। কিন্তু এর ফলে সঠিক দর দিয়েও অনেকে কাজ থেকে বঞ্চিত হন, আবার আদেশ পরিবর্তনের মাধ্যমে খরচ বাড়িয়ে নেয়ার কারণে সরকারি টাকারও অপচয় হয়।

এই অপব্যবহার চেনা যাবে যা দেখে : ঠিকাদারের কাছ থেকে ঘন ঘন ক্রয় আদেশ পরিবর্তনের অনুরোধ এবং বারবার একই কর্মকর্তার অনুমোদন, প্রাথমিক দরের চেয়ে শতকরা ৩ থেকে ৫ ভাগের কম দর দিয়ে কারো কাজ পাওয়া এবং কাজ শেষের পর তা অনেক বেড়ে যাওয়া, ক্রয় আদেশ বাস্তবায়নের মাঝখানে কাজের পরিধি বাড়িয়ে নেয়া, বিড ডকুমেন্টে কাজ বা উপকরণের বিবরণে অস্পষ্টতা এবং পরে সেই অস্পষ্টতার সুযোগ নিয়ে সেখানে নতুন নতুন উপকরণ কেনার খরচ যোগ করা। শুরুতে কোনো গবেষণা বা জরিপ ছাড়াই উপকরণের কম দাম দেখিয়ে ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের প্রাক্কলন দরপত্র তৈরি এবং পরে কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠানের জরিপ দেখিয়ে খরচ বাড়িয়ে নেয়া।

৬. দর-প্রস্তাবে কারসাজি : দর-প্রস্তাবে নানা উপায়ে কারসাজি হয়ে থাকে। ক্রয় কর্মকর্তারা সরাসরি এর সঙ্গে জড়িত থাকেন। অনেক সময় তাঁরা কোনো বিশেষ ঠিকাদারকে সুবিধা পাইয়ে দিতে অন্যদের দেয়া দর-প্রস্তাবের তথ্য গোপনে ফাঁস করে দেন। এর ফলে দেখা যায় সর্বনিম্ন দর থেকে সামান্য কম দিয়ে ঐ প্রতিষ্ঠান কাজ পেয়ে যায়। পছন্দের প্রতিষ্ঠানকে সুবিধা করে দিতে দেরিতে দর-প্রস্তাব গ্রহণ করা কিংবা অযথা দর জমা নেয়ার সময় বাড়ানোর মতো ঘটনাও কারসাজির বড় উদাহরণ। এ ধরনের ঘটনায় সাধারণত দেরিতে প্রস্তাব জমা দেয়া ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানই সর্বনিম্ন দরদাতা হন।

এর পরেও যদি পছন্দের প্রতিষ্ঠান কাজ না পায়, তাহলে বিজয়ী প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবে কোনো ভুল দেখিয়ে কৌশলে সেই কর্মকর্তা নতুন করে দরপত্র আহ্বান করেন। কখনো কখনো কোনো কারণ ছাড়াই যোগ্য দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। এসবই কারসাজির চিত্র।

ক্রয় আদেশ দেয়া, অনুমোদন বা টাকা ছাড়ের ক্ষমতা একই ব্যক্তির হাতে থাকলে এ সমস্যা বেশি দেখা যায়। কোনো কোনো সময় ঠিকাদার অযৌক্তিক রকমের কম দর দিয়ে কাজ পেয়ে যান। তারপর ক্রয় কর্মকর্তার সঙ্গে যোগসাজশ করে নানা রকমের নতুন খাত ও কারণ দেখিয়ে প্রকল্পের খরচ বাড়িয়ে নেন। প্রকল্প কর্মকর্তাও আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে কাজ দেয়ার পর ক্রয় আদেশে এমন পরিবর্তন আনেন। এর ফলে প্রকল্পের খরচও অনেক বেড়ে যায়। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে খরচ বাড়িয়ে নেয়ার এই প্রবণতা বেশি চোখে পড়ছে।

৭. স্বার্থের সংঘাত : এটি তখনই হয় যখন, ক্রয়ের সঙ্গে জড়িত সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে কাজ পাওয়া প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ জড়িত থাকে। এসব ক্ষেত্রে দেখা যায়, সেই কর্মকর্তা আগে কখনো দরদাতা প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করেছেন, অথবা তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানে এমন কোনো কাজ পেতে চেষ্টা করছেন (পরামর্শক বা চাকরি) যেখান থেকে তাঁর আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ আছে। এমনও দেখা যায়, সেই কর্মকর্তার পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ পাওয়া প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে। কোনো কোনো সময় দামি উপহার, বিদেশ ভ্রমণ বা সরাসরি ঘুষ লেনদেনের মাধ্যমেও স্বার্থের এই সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে।

কেনাকাটার ক্ষেত্রে যখন দেখা যায়, কোনো কর্মকর্তা একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের প্রতি অস্বাভাবিক রকম নমনীয় বা পক্ষপাতদুষ্ট অথবা যখন জানা যায় সেই কর্মকর্তা ঐ প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে আগ্রহী, তখন সেখানে সম্ভাব্য স্বার্থের সংঘাত রয়েছে, এমনটা ধরে নেয়া যেতে পারে। ক্রয়ের সঙ্গে জড়িত সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে যদি কাজ পাওয়া প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ ব্যক্তিদের সামাজিক ওঠাবসা থাকে অথবা যদি সেই কর্মকর্তার কোনো পার্শ্ব-ব্যবসা থাকে তখনো সতর্ক হতে হবে।

৮. স্বজনপ্রীতি : এই শব্দটির সঙ্গে কমবেশি সবাই পরিচিত। সরকারি কেনাকাটার ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি অনেক সময়ই প্রতিযোগিতার সুযোগকে নষ্ট করে দেয় এবং এর ফলে দুর্বল ও অযোগ্য প্রতিষ্ঠান কাজ পেয়ে যায়। দেখা যায়, উন্মুক্ত দরপত্র ডাকা হলেও কাজদাতা প্রতিষ্ঠানটির কোনো শীর্ষ কর্মকর্তার আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কাজ পাচ্ছে। এর মাধ্যমে কখনো কখনো কেনাকাটার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরাও আর্থিকভাবে লাভবান হন। এ ক্ষেত্রে ছোটখাটো কারণ দেখিয়ে যোগ্য প্রতিষ্ঠানকে বাদ দেয়া হয়।

স্বজনপ্রীতি হচ্ছে কি না, তা বোঝার কয়েকটি চিহ্ন রয়েছে। সতর্ক হতে হবে, যদি দেখা যায় দরদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকানায় এমন কেউ আছেন, যিনি বা যাঁরা ক্রয় আদেশ দেয়া প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পর্যায়ের কোনো কর্মকর্তার আত্মীয় অথবা ঘনিষ্ঠ। যদি দেখা যায়, স্বজনদের সুবিধা করে দিতে দরপত্রের বিজ্ঞাপন এমন জায়গায় ছাপা হয়েছে যা সহজে কারো চোখে পড়বে না (অখ্যাত গণমাধ্যমে) অথবা, যোগ্য বা সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে বাদ দেয়া হয়েছে ছোট বা নগণ্য কোনো কারণ দেখিয়ে।

৯. পৃষ্ঠপোষকতা বা আনুকূল্য : এই প্রবণতাটি পুরোপুরি রাজনৈতিক। এ ক্ষেত্রে একজন সরকারি কর্মকর্তা রাজনৈতিক অনুগ্রহ পেতে একটি নির্দিষ্ট দলের কাউকে কাজ দেন। পদোন্নতি, এলাকায় রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা বা আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে এ ধরনের কাজ করা হয়। প্রতিযোগিতাকে পাশ কাটিয়ে, নিজ ক্ষমতা ব্যবহার করে ক্রয় অনুমোদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ (মন্ত্রী, এমপি) যখন নিজ দলের নেতা-কর্মীদের কাজ দেন, সেটাও পৃষ্ঠপোষকতা।

কোনো ক্রয় অনুমোদনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আনুকূল্য আছে কি না, তা বুঝতে হলে দেখতে হবে, সব সময় একটি নির্দিষ্ট দলের অনুসারীরা কাজ পাচ্ছেন কি না। পেশাগত প্রয়োজনের বাইরে ক্রয় কর্মকর্তার সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মীদের যোগাযোগ কেমন? কাজ দেয়ার বিনিময়ে সেই কর্মকর্তা কোনো রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ বাস্তবায়নের ক্ষেত্র তৈরি করছেন কি না। শুধু

১৮ কোটি টাকার দরপত্রে অনিয়মের অভিযোগ

বরগুনায় তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পে (পিইডিপি-৩) ১৮ কোটি ২৬ হাজার টাকার দরপত্রে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব কাজ ১৮ ভাগ উর্ধ্ব দরে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক কয়েকজন ঠিকাদার।

এ ছাড়া গত মঙ্গলবার একটি গুচ্ছের কাজের দরপত্র জমাদানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ সময় ঠিকাদারদের দুই পক্ষের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা ও ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে।

সদর উপজেলা প্রকৌশলী কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ২৭ কোটি ৩৯ লাখ টাকা ব্যয়ে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সদর উপজেলার ৩৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের কক্ষ বর্ধিতকরণ ও আসবাব সরবরাহের জন্য আটটি গুচ্ছের দরপত্র আহ্বান করা হয় গত সেপ্টেম্বরে। দেড় মাসে ছয়টি গুচ্ছের দরপত্র জমা নেওয়া হয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ঠিকাদারেরা জানান, সরকারি হিসাবে প্রতিটি বিদ্যালয় বর্ধিতকরণের জন্য ৮৩ লাখ টাকা প্রাক্কলন ব্যয় নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু এর আগের ছয়টি গুচ্ছের মধ্যে পাঁচটি গুচ্ছে ২২টি বিদ্যালয় বর্ধিতকরণের ১৮ কোটি ২৬ লাখ টাকার কাজ সমঝোতার মাধ্যমে ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক কয়েকজন প্রভাবশালী ঠিকাদার শতকরা ১৮ ভাগ উর্ধ্ব দরে ভাগাভাগি করে নেন। একটি গুচ্ছের কাজে সমঝোতাপ্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে তা পাঁচ ভাগ নিম্ন দরে দাখিল হয়।

১৮ ভাগ উর্ধ্ব দরে দরপত্র জমা প্রসঙ্গে মাহবুবুল জানান, এটা আগের বছরের প্রাক্কলন হওয়ায় ঠিকাদারেরা ১৮ ভাগ উর্ধ্ব দরে দরপত্র জমা দিয়েছেন। একটি গুচ্ছে পাঁচ ভাগ নিম্নদরে দরপত্র দাখিল হওয়ায় একই কাজ দুই ধরনের দরে করানোর কারণ জানতে চাইলে প্রকৌশলী জানান, এটা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ব্যাপার। তাঁরা যে সিদ্ধান্ত নেবেন, সেটাই চূড়ান্ত।

প্রভাব বিস্তার

ক্রয় আদেশ

যোগসাজশ

আনুকূল্য

উদাহরণ : সরকারি ক্রয়ে নানা ধরনের অনিয়ম নিয়ে প্রতিবেদন

এমন ব্যক্তির মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কাজ পাচ্ছে কি না, যারা ক্রয় অনুমোদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজনীতিবিদের অনুসারী।

১০. চাঁদাবাজি : সরকারি কেনাকাটা বা প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটি অনেক পুরোনো। প্রভাবশালী ব্যক্তিরা অথবা রাজনৈতিক দলের কর্মীরা সাধারণত ঠিকাদারদের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে থাকেন। চাঁদা না পেয়ে সহিংস ঘটনার নজির এ দেশে অনেক আছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ে কাজের মানে। এই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ঠিকাদাররা কাজে নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার করেন। অনেক সময় চাঁদাবাজির কারণে প্রকল্পের কাজ অনেক দিন বন্ধ থাকে। ফলে খরচ বাড়ে।

চাঁদাবাজি যে শুধু দলের কর্মী বা প্রভাবশালীরাই করে থাকেন তা নয়। অনেক সময় কাজ দেয়ার আগে ঠিকাদারদের কাছ থেকে চাঁদা দাবি করেন ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তারাই। এই চাঁদা কখনো নেয়া হয় কাজের শুরুতে, কখনো কাজের মাঝ পর্যায়ে, কখনো বা কাজ শেষ করে টাকা বুঝে নেয়ার ঠিক আগে।

১১. প্রভাব খাটানো : টেন্ডার নিয়ে মারামারি, টেন্ডার বাক্স ছিনতাই, আগ্রহী ঠিকাদারদের দরপত্র জমা দিতে বাধা দেয়া, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিকে নানাভাবে হুমকি—এসব বিষয় দেশের পত্রপত্রিকায় বছরের পর বছর ধরে শিরোনাম হয়ে আসছে। স্থানীয়ভাবে বা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালীরা সরকারের কাজ পেতে এভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। অবশ্য প্রভাব বিস্তার যে শুধু এভাবেই হয়ে থাকে তা নয়। অনেক সময় ঘুষ বা আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তারা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে কাজ দিতে প্রতিষ্ঠানের নিম্নপদস্থদের ওপর চাপ প্রয়োগ করেন।

আত্মসাৎ

১২. আত্মসাৎ : সরকারি কাজে অনেকভাবেই টাকা আত্মসাৎ হয়। কখনো কাজ শেষ না করে টাকা তুলে নেয়া তো আছেই, কখনো কখনো একেবারেই কাজ না করে

স্থানীয় সরকার সহায়তা প্রকল্পের টাকা হরিলুট!

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলায় স্থানীয় সরকার সহায়তা প্রকল্পের (এলজিএসপি) টাকা লুটপাট করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রের ভাষ্যমতে, এসব প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা অর্থ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় থেকে সরাসরি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ব্যাংক হিসাবে পাঠানো হয়। আর এ সুযোগে কোনো কোনো প্রকল্পের আংশিক বাস্তবায়ন বা কোনোটির কোনো কাজ না করেই উপজেলার ছয়টি ইউনিয়নের নামে আসা অর্থের বেশির ভাগ ব্যাংক থেকে তুলে আত্মসাৎ করা হয়েছে। অথচ কাগজে-কলমে এসব প্রকল্প শত ভাগ বাস্তবায়ন দেখানো হয়েছে। .....

উদাহরণ : কাজ না করেই টাকা তুলে নেয়ার অভিযোগসংক্রান্ত প্রতিবেদন

টাকা তুলে নেয়ার ঘটনাও ঘটে। এভাবে জনগণের অর্থ চলে যায় ঠিকাদার ও ক্রয়ের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের পকেটে।

শুধু কাজ নয় পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রেও এ ধরনের ঘটনা ঘটে। দরপত্র অনুযায়ী যে পরিমাণ পণ্য দেয়ার কথা, তার চেয়ে কম দিয়ে সব টাকা তুলে নেয়াও এক ধরনের আত্মসাৎ। ধরা যাক, কোনো গ্রামে যদি ১০০ জনকে বয়স্ক ভাতা দেয়ার কথা। কিন্তু দেয়া হচ্ছে ৮০ জনকে। আবার মাথাপিছু যে পরিমাণ টাকা দেয়ার কথা, দেয়া হচ্ছে তার চেয়ে কম। এ সবই আত্মসাতের উদাহরণ। এটা এক ধরনের দুর্নীতিও বটে।

অপচয়

সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনার আরেকটি বড় দিক হচ্ছে অপচয়। অনেক সময় দেখা যায় প্রকল্প বা কেনাকাটার টেন্ডার-প্রক্রিয়ায় তেমন দুর্নীতি বা অনিয়ম হয়নি। কিন্তু যে কাজে টাকা খরচ করা হয়েছে তা মানুষের কোনো কাজে আসেনি। বিনিয়োগ থেকে কাঙ্ক্ষিত ফল না পাওয়া এক ধরনের অপচয়।

অনেক সময় দেখা যায়, প্রকল্প বাস্তবায়নে অযথা দেরি করার কারণে খরচ বেড়ে যায়। কখনো কখনো পরিকল্পনা পর্যায়ে পণ্য, সেবা বা কাজের আকার বাড়িয়ে দেখানো হয়। আবার এমনভাবে প্রকল্পের নকশা তৈরি হয়, যা পরে আর কাজে আসে না।

ধরা যাক, এমনভাবে একটি সেতু তৈরি হয়েছে, যা শুধু ঐ এলাকার কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির বাড়িকে সংযুক্ত করবে। কিন্তু বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কোনো কাজে আসবে না। অথবা টাকা খরচ করে সেতু তৈরি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সংযোগ-সড়ক না থাকায় কেউ তা ব্যবহার করতে পারছে না, কোটি টাকার পণ্য ক্রয় করে গোডাউনে ফেলে রাখা—এসবই অপচয়।

অদক্ষতা

দুর্নীতি বা অপচয় ছাড়াও সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রতিবেদনের একটি বড় ক্ষেত্র হতে পারে অদক্ষতা। অনেক সময় দেখা যায়, শুধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভুল সিদ্ধান্ত, প্রাক্কলন বা মূল্যায়নের জন্য প্রকল্পের খরচ বাড়ে, দুর্বল পরিবীক্ষণ বা তদারকির অভাবে কাজ বা পণ্য সরবরাহ হয় নিম্নমানের, যা শেষ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত ফলাফল থেকে বঞ্চিত করে জনগণকে। এ ছাড়া কর্মকর্তাদের সততা থাকা সত্ত্বেও অদক্ষতার কারণে সঠিক দরদাতা মূল্যায়নে বাদ পড়ে।

অব্যবস্থাপনা

দেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যবস্থাপনার সংকট ঐতিহাসিকভাবেই প্রবল। হোক তা উৎপাদনশীল খাত বা সেবা। সরকারি মালিকানার শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর লোকসানি প্রবণতা, সবকিছু ঠিক থাকার পরও কারখানায় ক্ষমতার চেয়ে কম উৎপাদন, বিপণনে দুর্বলতার কারণে পণ্য গুদামেই নষ্ট হওয়া অথবা ব্যাংকে খেলাপি ঋণ বেড়ে যাওয়া—এসবই অব্যবস্থাপনার চিরাচরিত উদাহরণ। এসব ঘটনা গভীর প্রভাব ফেলে সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনার ওপর।

পঞ্চম অধ্যায়

সরকারি ক্রয়ের ধাপ ও দুর্নীতি চেনার উপায়

সরকারি কেনাকাটার পদ্ধতি

সরকারি ক্রয় মূলত তিন ধরনের হয়ে থাকে। কাজ, পণ্য ও সেবা। রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে সেতু, ভবন, স্থাপনা—এমন সবকিছু নির্মাণই কাজের মধ্যে পড়ে। এ ছাড়া কোনো প্রকল্প বা প্রতিষ্ঠানের জন্য মালামাল, যন্ত্রপাতি অথবা খাদ্য, রাসায়নিকসহ নানা ধরনের পণ্যও কিনে থাকে সরকার। আর বিভিন্ন কাজের জন্য সরকার যে পরামর্শক নিয়োগ করে থাকে, সেটি সেবা ক্রয়ের একটি বড় উদাহরণ। কেনাকাটার ধরন যেমন কয়েক রকম, তেমনি পদ্ধতিও একাধিক। মূলত চারটি পদ্ধতিতে এই কেনাকাটা হয়ে থাকে।

- উন্মুক্ত ক্রয়-পদ্ধতি
- সীমিত ক্রয়-পদ্ধতি
- সরাসরি ক্রয়-পদ্ধতি
- কোটেশন

উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিকে (ওপেন টেন্ডারিং মেথড) সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হিসেবে ধরা হয়। এটি সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করে। এরপর আছে সীমিত দরপত্র পদ্ধতি বা লিমিটেড টেন্ডারিং মেথড। ক্রয়বিধিতে বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি ছাড়া অন্য পদ্ধতিকে নিরুৎসাহিতও করা হয়েছে। যখন দেখা যায় কোনো পণ্য, সেবা অথবা কাজ বিশ্বে বা দেশে কেবল হাতে-গোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানই করতে পারে, তখন তাদের কাছে সরাসরি সীমিত পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা যায়। অনেক সময় সরকার সরাসরিও ক্রয় করতে পারে। তবে এই পদ্ধতিতে প্রতিযোগিতা হয় না, তাই অস্বচ্ছতাও সবচেয়ে বেশি। নিতান্ত বাধ্য না হলে ক্রয় আইনেই এই পদ্ধতিকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে কত টাকা পর্যন্ত কাজ সীমিত, সরাসরি বা কোটেশন পদ্ধতিতে দেয়া যাবে, সেই সীমাও বেঁধে দেয়া হয়েছে।

১. সরকারি ক্রয়ের যত ধাপ : প্রতিযোগিতামূলক টেন্ডারের মাধ্যমে সরকারি ক্রয়-প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কয়েকটি ধাপ আছে। একে মোটা দাগে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে প্রথম ধাপ হলো প্রয়োজনীয়তা যাচাই এবং ক্রয়-পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা। স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় কী কাজ হবে, সেই কাজ থেকে স্থানীয় জনগণ কী সুবিধা পাবে, সেখানে বিনিয়োগ কতটা বাস্তবসম্মত, সেই প্রকল্প থেকে কত সংখ্যক মানুষ সুবিধা পাবে এবং ঐসব কাজ করতে হলে কী কী পণ্য দরকার তা মাথায় রেখে একটি ক্রয় বা কাজের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করা হয়।

যখন কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হয়, ঐ এলাকার জন্য প্রকল্পটি জরুরি এবং সেখানে বিনিয়োগ করলে টাকার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হবে, তখন তারা প্রকল্প এবং ক্রয়-পরিকল্পনা তৈরি শুরু করেন। এই পর্যায়ে তাঁরা কাজের পরিধি ঠিক করেন এবং গবেষণার মাধ্যমে বাজারদর যাচাই করে সেই কাজ বা কেনাকাটায় কী পরিমাণ খরচ হতে পারে তার একটি রূপরেখা তৈরি করেন। সেখানে কাজের জন্য কী পরিমাণে এবং কত ধরনের উপকরণ লাগবে, তার গুণগত মান কেমন হবে—এসব বিবরণ চূড়ান্ত হয়।

ক্রয়কাজ কোন পদ্ধতিতে করা হবে, উন্মুক্ত নাকি সীমিত, কোন সময়সীমার মধ্যে কাজটি করা হবে—এ ধরনের সিদ্ধান্তও ক্রয়-পরিকল্পনাতে থাকে। ঠিকাদাররা টেন্ডার জমা দিলে কত সময়ের মধ্যে মূল্যায়ন শেষ হবে, কার্যাদেশ দেয়া হবে এবং কত সময়ের মধ্যে ঐ কাজটি সম্পন্ন হবে—তাও ঠিক করা হয় এই ধাপে।

ক্রয়-প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় ধাপে, দরপত্র দলিল তৈরি করা হয়। সেই দলিলে যাঁরা দরপত্র প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন তাঁদের জন্য নির্দেশাবলি, যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হলে কোন কোন শর্তে তাঁদের সাথে চুক্তি হবে, কোন মাপকাঠিতে তাঁদের প্রস্তাব দরপত্র মূল্যায়ন করা হবে—এসব বিষয় থাকে। এর ভিত্তিতে পত্রিকায় কেনাকাটা বা কাজের জন্য দরপত্র চেয়ে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়।

উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে বিজ্ঞাপন দেখে আগ্রহী ঠিকাদাররা প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। একটি নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এই দরপত্র জমা দিতে হয়। অবশ্য ক্রয়কাজ কি পণ্য সরবরাহ, পূর্ত না সেবা অথবা কত টাকা প্রাক্কলিত দরের দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে তার ওপর ভিত্তি করে ক্রয়-পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয় এর ভিত্তিতে এই প্রক্রিয়ায় দরপত্রের সময়সীমায় কিছুটা হেরফের ঘটে। আর সীমিত দরপত্রের বেলায় এনলিস্টিং বা সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্তি হয়।

এর পরের ধাপটি মূলত দরপত্র খোলা, মূল্যায়ন এবং চূড়ান্ত ঠিকাদার নির্বাচনের। সব দরপত্র খোলার পর মূল্যায়ন কমিটি তা পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন জমা দেয়। সেখানে অংশ নেয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা ও কারিগরি প্রস্তাব দেখে মূল্যায়ন করা হয়। প্রয়োজনে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে তাদের দেয়া প্রস্তাবের সপক্ষে নানা ধরনের লিখিত ব্যাখ্যা চায় ক্রয় কর্তৃপক্ষ।

এরপর সবচেয়ে যোগ্য এবং সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ দেয়া হয়। এ সময় প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে কাজের জন্য যে চুক্তি হবে তার কাঠামোও চূড়ান্ত করা হয়। চুক্তির পর শুরু হয়

বাস্তবায়ন। অনেক সময় দেখা যায়, মাঝখানে কোনো এক পর্যায়ে এসে বাড়তি কোনো কেনাকাটা বা কাজ প্রয়োজন পড়ে। তখন চুক্তিতে পরিবর্তন আনতে হয়। একই সময় ধরে ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট সরকারি সংস্থা কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ বা পরিবীক্ষণ করতে থাকে। শেষ হলে কাজের মান কেমন হলো, টাকা সঠিকভাবে খরচ হলো কি না—এসব বিষয় মাথায় রেখে মূল্যায়ন ও নিরীক্ষা করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো।

চিত্র : সরকারি ক্রয়ের যত ধাপ

সরকারি ক্রয়ের প্রতিটি পর্যায়ে দুর্নীতি বা অনিয়মের সুযোগ রয়েছে। তাই টাকার অপচয় ঠেকাতে বিশ্বব্যাংক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, ওইসিডির মতো প্রতিষ্ঠানগুলো প্রত্যেক ধাপের জন্য নিজস্ব সতর্ক চিহ্ন বা রেড ফ্ল্যাগের তালিকা তৈরি করেছে। এসব চিহ্ন দেখলে বুঝতে হবে কোনো পণ্য বা সেবা কেনা অথবা প্রকল্পের কাজে সন্দেহজনক কিছু হচ্ছে। সরকারি কেনাকাটা নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি বা অনুসন্ধানের জন্য এই চিহ্নগুলো কাজে আসতে পারে। নিচে সেই চিহ্নগুলো দেয়া হলো।

২. সরকারি ক্রয়ে সতর্ক চিহ্ন

প্রয়োজন যাচাই ও ক্রয়-পরিকল্পনা

সতর্ক চিহ্ন

- ক্রয়-পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা যাচাইয়ে স্বচ্ছতার অভাব
- জনগণ, বেসরকারি খাত বা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই তাড়াহুড়ো করে প্রকল্প প্রস্তাব ক্রয় পরিকল্পনা তৈরি
- ক্রয়-পরিকল্পনা বা ক্রয়ের ঘোষণা প্রকাশ না করা বা এ নিয়ে গোপনীয়তা
- একই ধরনের পণ্য বা সেবা, ছোট ছোট লটে এমনভাবে কেনার পরিকল্পনা করা, যাতে প্রতিটি দর প্রতিযোগিতামূলক টেন্ডার-প্রক্রিয়ার নির্ধারিত সীমার নিচে থাকে
- কোনো পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা বা রাজনীতিবিদের বাড়ির কাছে নির্মাণ প্রকল্প
- উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতি বাদ দিয়ে সরাসরি বা সীমিত পদ্ধতিতে কেনাকাটার সিদ্ধান্ত

দরপত্র দলিল তৈরি ও দর আহ্বান

সতর্ক চিহ্ন

- দরপত্রে দেয়া শর্তগুলো সংকীর্ণ বা এমন, যাতে প্রতিযোগিতার সুযোগ কমে যায়
- দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞাপন শুধু অখ্যাত গণমাধ্যমে প্রকাশ
- সামান্য ত্রুটি দেখিয়ে অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানকে প্রাক্-বাছাইয়ে বাদ দেয়া
- প্রস্তাব সম্পর্কে ঠিকাদারের কাছে চাওয়া ব্যাখ্যার জবাব সঠিক সময়ে না দেয়া অথবা জবাবে সঠিক তথ্য এড়িয়ে যাওয়া
- প্রাক্-বিডিং সভার প্রশ্নোত্তরসহ আলোচনার পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক বিবরণী না রাখা
- টেন্ডারে অংশ নেয়া প্রতিষ্ঠানের জানতে চাওয়া ব্যাখ্যার লিখিত জবাব না দেয়া অথবা সেই জবাব অংশগ্রহণকারী সব বিডারকে সরবরাহ না করা
- দরপত্র জমা ও খোলার মাঝখানে লম্বা সময় বিরতি
- নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাবার পর কারো কাছে থেকে দর-প্রস্তাব জমা নেয়া
- বাক্সে অথবা খোলার আগে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা অবস্থায় দর-প্রস্তাব পরিবর্তন
- প্রকাশ্যে দর-প্রস্তাব না খোলা অথবা গুরুত্বপূর্ণ বিড তথ্য সবার জন্য প্রকাশ না করা

দর-প্রস্তাব মূল্যায়ন ও অনুমোদন

সতর্ক চিহ্ন

- মূল্যায়ন কমিটিতে রাজনৈতিক ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি
- দর-প্রক্রিয়ার মাঝপথে অন্য যোগ্য প্রতিষ্ঠানের এমনভাবে সরে যাওয়া, যাতে বেশী দর দেয়া একজন ঠিকাদারই টিকে থাকেন
- দরপত্র মূল্যায়ন ও নির্বাচিত প্রস্তাবের নাম ঘোষণায় অস্বাভাবিক সময় লাগানো বা দীর্ঘসূত্রিতা
- দর-প্রস্তাব জমা পড়ার পর মূল্যায়নের সময় শর্ত পরিবর্তন
- প্রতিযোগী দর-প্রস্তাবের মধ্যে অস্বাভাবিক মিল (প্রস্তাবের ধরন, পণ্যের একই দাম, বানান-ব্যাকরণে বা যোগ-বিয়োগে একই ভুল, ফটোকপি ডকুমেন্ট)
- অস্বাভাবিক দ্রুত সময়ের মধ্যে মূল্যায়ন প্রতিবেদন জমা
- কোনো ব্যাখ্যা ছাড়া অথবা দুর্বল ব্যাখ্যা দিয়ে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে বাদ দেয়া
- কার্যাদেশ প্রদানের পর চূড়ান্ত চুক্তি তৈরিতে অনেক সময় নেয়া
- বিড ডকুমেন্টের সঙ্গে চুক্তির শর্তে গরমিল (স্পেসিফিকেশন, পরিমাণ)
- হিসাবের ভুল সংশোধনের সময় ইচ্ছা মাফিক পরিবর্তন করা
- প্রয়োজনীয় দলিলাদি কোনো দর-প্রস্তাব থেকে সরিয়ে নেয়া

বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ

সতর্ক চিহ্ন

- কাজ দেয়া এবং কাজ তদারকের দায়িত্বে একই কর্মকর্তার ওপর ন্যস্ত করা
- ঠিকাদারকে কাজ দেয়ার পর চুক্তির স্পেসিফিকেশন বা কাজের পরিধিতে ইচ্ছামাফিক পরিবর্তন
- কাজের আদেশে ঘন ঘন পরিবর্তন
- পরিদর্শন প্রতিবেদনে নিম্ন মানের উপকরণ ব্যবহারের ইঙ্গিত, কাজ শেষ হবার পরও প্রকল্পের কার্যকারিতা না থাকা
- যে উদ্দেশ্যে পণ্য বা সেবা কেনা হয়েছে তা অর্জন না করা বা ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে না পারা
- প্রকল্প বাস্তবায়নের কোনো পর্যায়ে পণ্য বা সেবা সরবরাহে দেরি করা বা পরিমাণে কম বা বেশি করা
- ঠিকাদারকে অলিখিত নির্দেশ দিয়ে বাড়তি কাজ করিয়ে নেয়া
- বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে 'প্রগ্রেস পেমেন্ট' বা চালানপত্র সময়মতো দেয়া হচ্ছে না
- মেজারমেন্ট বুক (এমবি বুক) এ বাস্তবায়নের সঠিক তথ্য না দেয়া
- 'প্রগ্রেস পেমেন্ট' পেতে অনেক জনের স্বাক্ষর নিতে হচ্ছে
- ঠিকাদারের পারফরম্যান্স পর্যালোচনা নথিবদ্ধ করা হয়নি
- প্রকল্পের খরচ বেড়েছে, কিন্তু কী কারণে তার যথেষ্ট ব্যাখ্যা নেই
- প্রকল্পের আর্থিক এবং পারফরম্যান্স অডিট প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়নি
- স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সঠিক মালামাল বুঝে না নেয়া
- বুঝে নেয়া মালামাল রেজিস্টারে না তোলা

৭০টি রেলইঞ্জিন কেনা হচ্ছে পছন্দের প্রতিষ্ঠান থেকে

বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৭০টি নতুন মিটারগেজ ইঞ্জিন কেনা হচ্ছে। এজন্য প্রায় দুই হাজার কোটি টাকার জোগান দেবে বিদেশি দাতা সংস্থা। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে, সরকারি নিয়ম ভেঙে দরপত্রে এমন সব শর্ত দেওয়া হয়েছে, যাতে একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কেউই দরপত্রে অংশ নিতে পারবে না।

এ সম্পর্কে জানতে চাইলে রেলমন্ত্রী মুজিবুল হক বলেন, 'ইঞ্জিন কেনা নিয়ে একেক সরবরাহকারী একেক কথা বলছে। এদের সবার কথা এক নয়। আমরা এ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলছি। দেশের জন্য যেটা ভালো, সেটাই করা হবে।'

বাংলাদেশ রেলওয়ের আধুনিকায়নে যেসব প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, তার একটি হলো ৭০টি মিটারগেজ ইঞ্জিন কেনা। গত বছরের সেপ্টেম্বরে এ-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়। ২৫টির মতো প্রতিষ্ঠান দরপত্র কেনে। আগামী ৩০ জানুয়ারি দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন।

দরপত্রের শর্তে বলা হয়, ইঞ্জিন কেনার অর্থের জোগানদাতা ঠিক করবে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান। রেলওয়ে নিয়মিত কিস্তিতে সেই অর্থ পরিশোধ করবে। ৭০টি ইঞ্জিনের মধ্যে কিছু ইঞ্জিন নেওয়া হবে সম্পূর্ণ চালু অবস্থায়, যাতে কেনার পরপরই নামানো যায়। আর কিছু থাকবে আংশিক খোলা, অন্যগুলো থাকবে সম্পূর্ণ খোলা অবস্থায়। রেলওয়ের নিজস্ব কারখানায় এসব ইঞ্জিন সংযোজন করা হবে।

রেল ভবন সূত্র জানায়, ২৫টি প্রতিষ্ঠান দরপত্র কিনলেও প্রাক্-দরপত্র বৈঠকে মাত্র ছয়টি প্রতিষ্ঠান অংশ নেবে। এগুলো হলো : যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল মোটরস (জিএম কোরিয়া ইউনিট), ক্যাটারপিলার, জার্মানির সিমেন্স, এমটিইউ, যুক্তরাজ্যের কুমিন্স ও কানাডার বোম্বারডিয়ার। রেলওয়ে দরপত্র দলিলে ইঞ্জিনের ঘূর্ণনের একক নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। এতে বলা হয়, ইঞ্জিনের আরপিএম (রোটেশন পার মিনিট) হতে হবে ৯০০-১১০০ এর মধ্যে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি ইঞ্জিন মিনিটে কতবার ঘুরবে, তা নির্দেশ করে।

একটি বহুজাতিক কোম্পানির একজন কর্মকর্তা বলেন, ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে এই ঘূর্ণনের এককের ওপরই সবকিছু নির্ভর করছে। দরপত্রে ঘূর্ণনের যে মানের কথা বলা হয়েছে, সে রকম ইঞ্জিন জেনারেল মোটরসের কোরিয়া ইউনিট ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ তৈরি করে না। এটি ইএমডি-৭১০ সিরিজ ইঞ্জিন নামে পরিচিত। বাংলাদেশ রেলওয়ে দীর্ঘদিন ধরে এ ইঞ্জিনই ব্যবহার করে আসছে। ২০১০ সালেও বাংলাদেশ একই ইঞ্জিন কিনেছে, এবারও তা-ই কিনবে। শুধু লোক দেখানো দরপত্র ডেকে তাদের পছন্দের ইঞ্জিন কেনাকে বৈধ করা হচ্ছে।

ওই কর্মকর্তা বলেন, এটা সরকারের গণক্রয় আইনের ১৫ ধারা এবং ক্রয়বিধির ২৯ ধারার পরিপন্থী। তিনি বলেন, আরপিএম উন্মুক্ত করে দিলে বড় বড় ইঞ্জিন প্রস্তুতকারকেরা দরপত্রে অংশ নিতে পারবে। এটা নির্দিষ্ট (৯০০-১১০০) করে দেওয়ার কারণে একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান ছাড়া কেউ অংশ নিতে পারবে না। উল্লেখ্য, গণক্রয় নীতিমালার ১৫ ধারায় বলা হয়েছে, 'ক্রয়কারী, দরপত্রদাতাগণের মধ্যে পক্ষপাতহীন ও উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে, ক্রয়ের জন্য নির্দিষ্টকৃত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা, অথবা কার্য ও ভৌত সেবার কারিগরি বিনির্দেশ ও বর্ণনা প্রস্তুত করিবার সময় উহা যেন সীমাবদ্ধকর না হয় তাহার নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে। প্রতিযোগিতা সীমিত করিতে পারে এইরূপ কোনো শর্ত আরোপ করা যাইবে না।'

যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল মোটরসের ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা গেছে, ইএমডি-৭১০ সিরিজ ইঞ্জিনই একমাত্র দুই স্ট্রোক ইঞ্জিন, যা এখনো রেলওয়ে ব্যবহার করছে। এ ইঞ্জিন ছাড়া দুই স্ট্রোকের আর কোনো ইঞ্জিন নেই। দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই স্ট্রোকের ইঞ্জিনের ব্যবহার সরকার বন্ধ করে দিলেও রেলওয়ে দুই স্ট্রোক ইঞ্জিন ব্যবহার করছে। সূত্র জানায়, ইঞ্জিন সরবরাহের ব্যাপারে দুটি বহুজাতিক কোম্পানি রেলওয়ের কাছে লিখিতভাবে আপত্তি জানিয়েছে। আপত্তিতে বলা হয়, রেলওয়ে যে ইঞ্জিন কিনবে সেটা ২০ বছরের পুরোনা মডেলের এবং দুই স্ট্রোকবিশিষ্ট। এতে জ্বালানি খরচও বেশি। বর্তমানে সারা দুনিয়ায় যেসব ইঞ্জিন চালু রয়েছে, তাতে ইএমডি-৭১০ সিরিজের তুলনায় ১০ শতাংশ জ্বালানি সাশ্রয় হয়। এতে প্রতিটি ইঞ্জিন বছরে ৫০ লাখ টাকার জ্বালানি সাশ্রয় করবে। এ হিসাবে ৭০টি ইঞ্জিন ২০ বছরের মেয়াদে শুধু তেলই সাশ্রয় করবে ৭০০ কোটি টাকার। এটা পরিবেশবান্ধবও।

সূত্র জানায়, অন্য একজন সরবরাহকারী অভিযোগ করেন, ইঞ্জিন সরবরাহকারীদের কাছ থেকে পৃথক দুটি খামে দর চাওয়া হয়েছে। একটি থাকবে কারিগরি ও অন্যটি অর্থনৈতিক। আন্তর্জাতিক দরপত্রের ক্ষেত্রে দুই খামে দর পাওয়ার কোনো বিধান নেই। এটা স্থানীয় কেনাকাটার ক্ষেত্রেই করা হয়। এটি সরকারি ক্রয়নীতিমালার পরিপন্থী।

জানতে চাইলে রেলওয়ের সরঞ্জাম কেনাকাটার দায়িত্বে থাকা অতিরিক্ত মহাপরিচালক খলিলুর রহমান বলেন, রেলওয়ে দীর্ঘদিন ধরে যে ইঞ্জিন ব্যবহার করে আসছে, এবারও সেই একই ইঞ্জিন কেনা হবে। নতুন কোম্পানির নতুন মডেলের ইঞ্জিন কেনা হলে রেলওয়ের লোকজন তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারবে না। জ্বালানি তেল সাশ্রয়ের প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, তেলের খরচ কমাতে গিয়ে রেলওয়ের লোকজনের জন্য যদি আরও বড় ক্ষতি হয়ে যায়, তাহলে কী হবে?

সব ইঞ্জিন তো সম্পূর্ণ তৈরি অবস্থায় আসছে না, কিছু তো খোলা অবস্থায় আসবে। সেসব ইঞ্জিন সংযোজন করতে গিয়ে লোকজন তো দক্ষ হয়ে উঠবে, তা হলে কেন এসব বলছেন? জানতে চাইলে তিনি বলেন, কম আরপিএমের ইঞ্জিন বাংলাদেশের জন্য উপযোগী। এর আগে বেশি আরপিএমের ইঞ্জিন কেনা হয়েছিল। কিন্তু তার ফল ভালো হয়নি। এ কারণে আগের ইঞ্জিনই কেনা হচ্ছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রেলওয়ের একজন সাবেক কর্মকর্তা বলেন, ২০১০ সালের রেলওয়ে একই সরবরাহকারী অর্থাৎ জিএম মোটরসের কোরিয়া ইউনিট থেকে নয়টি ইঞ্জিন ক্রয় করে। এর প্রতিটির দাম ছিল ২৮ লাখ মার্কিন ডলার। সেই একই প্রতিষ্ঠানের একই ইঞ্জিন ২০১১-১২ অর্থবছরে কেনা হয় ৩৫ লাখ মার্কিন ডলারে (প্রায় ২৮ কোটি টাকা)। এবারের ৭০টির ক্ষেত্রে দাম আরও বাড়তে পারে বলে আভাস দিয়ে ওই কর্মকর্তা বলেন, এভাবে একটি প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহের সুযোগ দেওয়া হলে সরকারি অর্থের অপচয় হবে।

ক্রয়-প্রক্রিয়ায় অনিয়মের উদাহরণ

ওপরের প্রতিবেদনটি ক্রয়-পরিকল্পনা পর্যায়ে অনিয়মের একটি ভালো উদাহরণ। এখানে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার বক্তব্য থেকে দেখা যাচ্ছে, রেল বিভাগ দরপত্রের শর্তই এমনভাবে বেঁধে দিয়েছে যাতে একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানই ইঞ্জিন সরবরাহের কাজ পায়। 'ইঞ্জিনের আরপিএম বা রোটেশন পার মিনিট ৯০০-১১০০ এর মধ্যে হতে হবে' এমন শর্ত থাকার কারণে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সীমিত হয়ে যায়। দরপত্র দলিল তৈরির সময় এমন সংকীর্ণ শর্ত থাকা, ক্রয়-প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য দুর্নীতির প্রাথমিক ইঙ্গিত। শুধু তা-ই নয়, এ ধরনের শর্তের কারণে ইঞ্জিনের দাম ও পরিচালন ব্যয়ে কী প্রভাব পড়বে তা ঠিকমতো যাচাই করা হয়নি। উপযুক্ত অন্য ইঞ্জিনগুলোর বাজার দর নিয়ে পর্যাপ্ত গবেষনাও ছিলো না। কর্তৃপক্ষ বলছে, রেলওয়ে আগে যে ইঞ্জিন কিনেছে, এবারও তাই কিনতে যাচ্ছে। এর অর্থ ক্রয়-পরিকল্পনার সময়ই তারা ঠিক করে রেখেছিলেন কার কাছ থেকে ইঞ্জিনটি কেনা হবে। এভাবে ক্রয়-পরিকল্পনার সময়ই প্রতিযোগিতার সুযোগ নষ্ট করে, একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেয়ার নজির খুঁজলে আরো অনেক পাওয়া যাবে। এমন ক্ষেত্রে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান এবং ক্রয়-প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তারা সম্ভাব্য দুর্নীতির ইঙ্গিত এবং বিশ্লেষণ দিয়ে প্রতিবেদককে আগে থেকে সতর্ক বা সহায়তা করতে পারেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

তথ্যের সম্ভাব্য উৎস

সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রতিবেদন তৈরির জন্য বেশ কয়েকটি প্রকাশনা বা দলিল তথ্যের উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। এর মধ্যে কিছু কাজে আসতে পারে প্রাথমিক তথ্যের যোগানদাতা হিসেবে (বাজেট বই), কিছু সম্ভাব্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্র (অডিট ও আইএমইডি প্রকাশনা) হিসেবে। কোনো কোনো প্রকাশনা (বিশ্বব্যাংক বা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠানের পর্যালোচনা) তহবিল ব্যবস্থাপনার ধরন বিশ্লেষণেও প্রতিবেদককে সাহায্য করতে পারে। সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে অনুসন্ধানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হতে পারে অনুমোদিত প্রকল্প দলিল এবং টেন্ডার ডকুমেন্ট। তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের সুযোগ তো আছেই। এই অধ্যায়ে মূলত এসব প্রকাশনা বা তথ্যসূত্র নিয়ে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাজেট প্রকাশনা

সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনার সবকিছু শুরু বাজেট থেকে, শেষও এখানেই। তাই এই বিষয়ে প্রতিবেদনের জন্য সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক দলিল বলা যেতে পারে বাজেটের বইগুলোকে। অর্থমন্ত্রী প্রতিবছর যখন সংসদে জাতীয় বাজেট পেশ করেন, তখন উপস্থিত সাংবাদিকদের এক সেট বই দেয়া হয়। সেখানে থাকে :

- বাজেট-বক্তৃতা
- বাজেটের সংক্ষিপ্তসার
- মঞ্জুরি বরাদ্দের দাবি
- মধ্যমেয়াদি বাজেট-কাঠামো
- জেন্ডার বাজেট
- বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি
- সংযুক্ত তহবিল (প্রাপ্তি)
- অর্থনৈতিক সমীক্ষা

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই প্রকাশনাগুলোর মধ্যে শুধু বক্তৃতা ও সংক্ষিপ্তসার ঘেঁটে প্রতিবেদন তৈরি হয় দেশের গণমাধ্যমগুলোতে, তাও শুধু সংসদে বাজেট পেশের দিন। বাকি বছর জুড়ে বইগুলোর ব্যবহার হয় না বললেই চলে। কিন্তু এর প্রতিটি সরকারি আয় ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা নিয়ে সাংবাদিকতার জন্য মৌলিক সব তথ্য-উপাত্ত জোগান দিতে পারে।

যেমন : সংযুক্ত তহবিল। সরকার কোত্থেকে কত আয় করতে চায়, তার বিস্তারিত বিবরণ এই বইয়ে থাকে। যদি কেউ আয়কর নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতে চান, তাহলে এখানেই পাওয়া যাবে, সরকার এই আয়করের কতটা ব্যক্তি শ্রেণি আর কত ভাগ কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে আদায় করতে চায়। তার জন্য চলতি বছর সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে কী পরিমাণ আয় আশা করা হচ্ছে তারও বিবরণ এখানে রয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে ইউনিলিভারের কথা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এই প্রতিষ্ঠান থেকে সরকার ১৫০ কোটি টাকা মুনাফা আশা করছে। এরকম প্রতিষ্ঠান ধরে প্রতিবেদন তৈরি করতে চাইলে, আয়ের প্রত্যাশা ও বাস্তবতা সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা সংযুক্ত তহবিল থেকে পাওয়া সম্ভব।

একইভাবে সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিশ্লেষণ পাওয়া যায় *মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবিসমূহ* নামের বই থেকে। কোন মন্ত্রণালয় কত ব্যয় করছে, উন্নয়ন হোক বা অনুন্নয়ন, প্রকল্প এবং খাত ধরে ব্যয় সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ থাকে এখানে। কোনো প্রকল্পের পটভূমি বা প্রাসঙ্গিক তথ্য জানার জন্য এই বই কার্যকর।

বাজেটের এসব বইয়ের পাশাপাশি তথ্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বা এডিপি। কোন উন্নয়ন প্রকল্পের আকার কত বড়, সেটি কত বছর ধরে চলছে, অর্থায়নের ধরন কী—এমন তথ্য পাওয়া যায় এই প্রকাশনায়। বছর জুড়ে রিপোর্টিংয়ের জন্য সরকারের নেয়া উন্নয়ন প্রকল্পগুলো সম্পর্কে তথ্যের জোগান দিতে পারে বইটি।

৩৯ - শিল্প মন্ত্রণালয়

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

প্রাতিষ্ঠানিক কোড	প্রাতিষ্ঠানিক কোড	প্রাতিষ্ঠানিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০১৪-১৫	সংশোধিত ২০১৩-১৪	বাজেট ২০১৩-১৪
	২৭৯১		**ইউনিলিভার (বাংলাদেশ) লিমিটেড**			
		১৫০০-২৯৯৯	**কর ব্যতীত প্রাপ্তি**			
			লভ্যাংশ ও মুনাফা			
		১৫১১	লভ্যাংশ ও মুনাফা ঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত	১৫০,০০,০০	১৫০,০০,০০	১৫০,০০,০০
			উপ-মোট-লভ্যাংশ ও মুনাফা	১৫০,০০,০০	১৫০,০০,০০	১৫০,০০,০০
			উপ-মোট-কর ব্যতীত প্রাপ্তি	১৫০,০০,০০	১৫০,০০,০০	১৫০,০০,০০
			মোট - ইউনিলিভার (বাংলাদেশ) লিমিটেড	১৫০,০০,০০	১৫০,০০,০০	১৫০,০০,০০

চিত্র : সংযুক্ত তহবিল (প্রাপ্তি) বইয়ে যেভাবে সরকারি আয়ের খাতভিত্তিক বিবরণ থাকে

দরপত্র দলিল

সরকারি কেনাকাটা নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর দলিল হতে পারে দরপত্র দলিল। এ ক্ষেত্রে দুটি ডকুমেন্ট সংগ্রহে রাখা জরুরি। প্রথমত, ক্রয় কর্তৃপক্ষের দেয়া প্রাথমিক দরপত্র, যার ভিত্তিতে ঠিকাদাররা দর প্রস্তাব দেবেন। দ্বিতীয়ত হলো দর-প্রস্তাব অর্থাৎ বিড ডকুমেন্টের ভিত্তিতে তৈরি করে যে দলিল ঠিকাদাররা জমা দেবেন। কাজ পাওয়ার জন্য যে যে শর্ত দেয়া আছে, ঠিকাদারি কোম্পানির সেই যোগ্যতা আছে কি না, তা যাচাইয়ের একমাত্র উপায় হলো এই দুটি ডকুমেন্টের তুলনা করা। একইভাবে স্পেসিফিকেশন বা বিনির্দেশ অনুযায়ী মালামাল বা পণ্য সরবরাহ করা হচ্ছে কি না, তা অনুসন্ধান করতে গেলেও এই দলিল এবং চুক্তিপত্র লাগবে।

দর-প্রস্তাবের জমা দেয়ার সময় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান একটি অঙ্গীকারনামা দেয়, যা টেন্ডার সাবমিশন ফরম নামে পরিচিত। এই প্রতিষ্ঠানটি অতীতে কোনো জালিয়াতি বা অনিয়ম করেছে কি না, কোথাও কালো তালিকাভুক্ত কি না অথবা তাদের কাজের অভিজ্ঞতা—এমন অনেক প্রশ্নের জবাব দিয়ে এটি তৈরি করা হয়। আগে অভিযুক্ত হয়েছে এমন অনেক প্রতিষ্ঠানই এই তথ্য গোপন করে অঙ্গীকারনামা জমা দেয়। এই কাগজ দেখে বোঝা যায়, কাজ পেতে প্রতিষ্ঠানটি কোনো মিথ্যা তথ্য দিচ্ছে কি না। একইভাবে ঠিকাদারের সঙ্গে হওয়া চুক্তিও ক্রয়বিষয়ক রিপোর্টিংয়ের জন্য খুবই কার্যকর একটি ডকুমেন্ট।

অনেক সময় ঠিকাদারি বা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নাম এবং ক্ষেত্রেভেদে জীবনবৃত্তান্ত জমা দেয়। এই ব্যক্তিরা আদৌ সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত কি না অথবা তাঁদের জীবনবৃত্তান্তে দেয়া তথ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ অভিজ্ঞতা আছে কি না, তা যাচাইয়েও টেন্ডার ডকুমেন্ট বা প্রস্তাব দলিল কাজে আসে।

নিচের প্রতিবেদনটিতে দেখা যাচ্ছে, পদ্মা সেতুর কাজ পেতে দর-প্রস্তাব জমা দেয়া একটি কোম্পানির ওপর আগে থেকেই সাময়িক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখেছিল বিশ্বব্যাংক। এই তথ্য গোপন করে প্রতিষ্ঠানটি তাদের কারিগরি প্রস্তাব জমা দেয়। দরপত্রেই উল্লেখ করা ছিল, দাতা প্রতিষ্ঠানের কাছে সাময়িকভাবে কালো তালিকাভুক্ত হলেও তাদের প্রস্তাব অযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। এ ধরনের প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে দরপত্রের শর্ত, প্রতিষ্ঠানের জমা দেয়া বিবরণী সম্পর্কে জানা জরুরি। সেই সঙ্গে গবেষণা বা অনুসন্ধান করে দেখতে হবে, শর্তের সঙ্গে মিল রেখে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান যে তথ্য দিচ্ছে তা কতটা সঠিক।

Failed company to get $0.78b Padma job

Tender rules 'overlooked' to favour Chinese firm

Chinese company Sinohydro Corporation, which has kept the Dhaka-Chittagong Highway Expansion project stalled for two years, may bag the Padma Bridge River Training Project by offering a questionably lower price.

The Chinese company is supposed to be ineligible to take part in this massive tender as it is facing the World Bank's "early temporary suspension" for suspected wrongdoings. As per tender rule, the government is supposed to disqualify such a bidder.

Sinohydro, Korean Hyundai and Belgian Jan De Nul submitted financial proposals to the Bridges Division on June 19 and evaluation of their bids is going on.

Sources say Sinohydro has offered to carry out river training works for the Padma Bridge construction for Tk 9,224 crore. It has, at a later stage, additionally offered a 5.6 percent discount on its offer, slashing its price down to Tk 8,778 crore.

Hyundai and Jan De Nul have offered Tk 12,122 crore and Tk 12,324 crore for the same job respectively.

Sinohydro snatched the Dhaka-Chittagong Highway Expansion job by making a similarly low offer in 2010. But later it totally stopped the expansion works in a 140 km part of the highway and started demanding higher payment. Till date, the company has completed less than 50 percent of work that was supposed to be completed by December 2013.

Its delay strategy has now doubled the project cost from Tk 1,655 crore.

But its pitiable performance in the highway project had never been penalised by blacklisting. At times, Communication Minister Obaidul Quader blasted the company for delaying the work, but in general the government is persuading the company to finish the job.

Sinohydro is being backed by Sahco, the family-owned company of former communication minister Syed Abul Hossain, who had given the firm the Dhaka-Chittagong Highway job. Hossain, who lost his job due to the World Bank's allegation of corruption conspiracy in the Padma Bridge tender, is now allegedly exerting his influence to bag the river training job.

On June 30 and July 1, Hyundai and Jan De Nul informed the authorities that Sinohydro was under early temporary suspension of the World Bank and was not eligible to continue with the bidding process.

The two bidders quoted the tender document that states, "A firm or an individual may be declared ineligible to be awarded a Bank-financed contract upon completion of the Bank's sanctions proceedings as per its sanctions procedures, including inter alia: (i) temporary suspension in connection with an ongoing sanction proceedings."

They noted that the temporary suspension process is confidential. "However, this can be verified and validated by the Government of Bangladesh by officially writing to Ms Elizabeth Lin Forder, Secretary to the Sanctions Board of the World Bank…," wrote Hyundai that also gave several other tips to the government to crosscheck its allegation.

River training is the second costly component of the $3 billion Padma Bridge project. This component deals with stopping river erosion, maintaining navigability and dredging more than 11 km area near Jajira and 3 km area in Maowa.

The contractor will need to use nearly 22 million geo-textile bags and filters, one million tonnes of concrete aggregates, 0.25 million tonnes cement and 0.8 million tonne sand as part of the training works. Besides, this job needs excavators, bulldozers, concrete pumps, dump trucks, mobile and crawler cranes, wheel loaders, etc.

Despite the complexity of the work that demands the right price, not just the lowest one, the government might fall for the lowest offer, the official said.

Liao Libing, deputy representative of Sinohydro in Bangladesh, said his company had no problem with bidding for the river training since it was not blacklisted by the World Bank.

He said Hyundai and Jan De Nul had complained against his company only after knowing that none of them would get the job. "They are desperate to brand us as a blacklisted firm," he told over phone.

Liao refuted the allegation that Sahco, a company owned by former communications minister Syed Abul Hossain, is lobbying for Sinohydro so that it got the river training job.

"I don't have any contact with the company," he claimed.

Project Director of Padma Bridge Shafiqul Islam said, "There is an evaluation committee that is looking into everything. Evaluation into the financial offers of the bidders is going on."

Shafiqul, who is also a member of the evaluation committee, said the usual practice was that the evaluation committee would take any complaint into consideration with a view to resolving it.

দরপত্র দলিলের ভিত্তিতে কাজ দেয়ায় অনিয়মের
অভিযোগসংক্রান্ত প্রতিবেদন

আইএমইডি প্রতিবেদন

বাজেটে নেয়া উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন অবস্থা পর্যালোচনার জন্য শীর্ষ সরকারি প্রতিষ্ঠান হলো বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ বা আইএমইডি। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কাজের অগ্রগতি বা মান কেমন, আংশিক শেষ হওয়া প্রকল্প থেকে মানুষ কতটা সুফল পাচ্ছে, কাজ শেষ হলে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে কি না অথবা প্রকল্পে সরকারি ক্রয়বিধি মানা হয়েছে কি না—এসব বিষয় সম্পর্কে সরেজমিন তথ্য সংগ্রহের পর তারা প্রকল্পভিত্তিক একটি প্রতিবেদন তৈরি করে। সেই প্রতিবেদনে তাদের পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশও তুলে ধরা হয়। ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি তদারকির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন এটি।

বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ মূলত সরকারের প্রাপ্তি ও ব্যয়ের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ। এর আওতায় বাজেটে আয় ও ব্যয়ের যে রূপরেখা দেয়া হয়েছে তার সঙ্গে মিল রেখে আদায় ও খরচ হচ্ছে কি না, যে উদ্দেশ্যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সে উদ্দেশ্য অর্জন হচ্ছে কি না এবং বাজেটে বরাদ্দ নেই, এমন খাতে টাকা ব্যয় হচ্ছে কি না, তা পরিবীক্ষণ করা হয়। এর মাধ্যমে ব্যয়ের সঙ্গে সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতি বিধানের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

আইএমডির তদন্ত প্রতিবেদন

খরচ না করেই অর্থ তুলে নিয়েছে বিআইডব্লিউটিএ

খরচ না করেই প্রকল্পের টাকা উঠিয়ে নিয়ে গেছে খোদ সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)। প্রকৃত দরের চেয়ে বেশি দর দেখিয়ে অর্থ তুলে নিয়েছে সংস্থাটি।

নদীর নাব্যতা রক্ষায় ড্রেজিং করতে গিয়ে নিজস্ব ড্রেজার ও লোকবল থাকার পরও বেসরকারি খাতের ড্রেজিংয়ের সমান দর দেখিয়ে প্রায় পৌনে দুই কোটি টাকার অতিরিক্ত বিল তুলে সংস্থার নিজস্ব তহবিলে জমা করা হয়েছে।

ঢাকা-মংলা ও চট্টগ্রাম-মংলা নৌপথদ্বয়ের সংযোগ রক্ষাকারী গাবখান খাল ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে প্রশস্তকরণ ও নাব্যতা উন্নয়ন প্রকল্পে এই অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে। পরিকল্পনা কমিশনের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এক তদন্তে এই অনিয়মের ঘটনা উদ্ঘাটন করেছে। .....

আইএমইডি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তৈরি সংবাদের উদাহরণ

অডিট প্রতিবেদন

অর্থবছর শেষ হওয়ার পর সরকার কোথায় কত টাকা কীভাবে খরচ করল তা নিরীক্ষা করে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়। সরকারি দপ্তর, সংস্থা এবং বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে কি না, সরকারি ব্যয় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে কি না এবং বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান কতটা দক্ষতার সঙ্গে বরাদ্দ পাওয়া টাকা খরচ করতে পেরেছে তা নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ প্রতিবেদন তারা জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করেন।

জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সরকারি অর্থ যথাযথ ব্যয়ের বিষয়ে নজরদারির ভূমিকা পালন করে। সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করার বিষয়েও কমিটি দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে।

এই দপ্তর মূলত তিন ধরনের অডিট করে। আর্থিক নিরীক্ষা, কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা এবং পারফরমেন্স নিরীক্ষা। এ ছাড়া এখন তথ্যপ্রযুক্তি নিরীক্ষা, পরিবেশবিষয়ক নিরীক্ষা এবং সামাজিক নিরীক্ষার মতো বিষয়ও তাদের কর্মপরিধিতে যোগ হচ্ছে। অডিট করতে গিয়ে তারা কয়েকটি বিষয়ের ওপর জোর দেন। যেমন : আর্থিক বিধিবিধান মানা হয়েছে কি না, সরকারি আদেশ-নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন অনুসরণ করা হয়েছে কি না, ক্রয় চুক্তির শর্ত অনুসরণ করা হয়েছে কি না এবং কোনো অনিয়মের ক্ষেত্রে সেখানে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কেমন ছিল।

অডিট প্রতিবেদনে মূলত দুটি ধাপ। এর মধ্যে প্রথম খণ্ড মূলত নিরীক্ষার বিষয়বস্তু, অনিয়মের কারণ, ক্ষতির পরিমাণ এবং সুপারিশের একটি সারসংক্ষেপ। আর দ্বিতীয় ধাপে থাকে, অনিয়ম বা পরিস্থিতি সম্পর্কে নিরীক্ষাকারীদের মূল্যায়নকে প্রতিষ্ঠিত করার মতো প্রমাণ ও তথ্য-উপাত্ত।

প্রথম ধাপে যা থাকে :

- **অডিট অনুচ্ছেদের সারসংক্ষেপ**
  অনুচ্ছেদ নম্বর, আপত্তির শিরোনাম, জড়িত অর্থের পরিমাণ
- **অডিট বিষয়ক তথ্য**
  নিরীক্ষা বছর, নিরীক্ষার প্রকৃতি, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও সময়কাল
- **নিরীক্ষা পদ্ধতি**
  কর্মকর্তা/কর্মচারীর সঙ্গে আলোচনা, রেকর্ডপত্র পরীক্ষা, তথ্য বিশ্লেষণ
- **ম্যানেজমেন্ট ইস্যু**
- **অনিয়ম ও ক্ষতির কারণ**
- **প্রতিষ্ঠানের জবাব**
- **অডিটের সুপারিশ**

সাধারণত একটি অর্থবছর শেষ হলে কোনো প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পে অডিট শুরু হয়। এই কাজ করতে অনেক সময় লেগে যায়। শেষ পর্যন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ হতে হতে অনিয়মের ঘটনাটি অনেক পুরোনো হয়ে যায়। কিন্তু তার পরও এই প্রতিবেদন অনুসন্ধানের জন্য তথ্যের সবচেয়ে বড় উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। এখন অডিট প্রতিবেদনগুলো সময়ের এই ব্যবধান অনেকটা কমিয়ে এনেছে।

অনুচ্ছেদ-০২

শিরোনাম : ক্রয় কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রতা, অবহেলা ও অব্যবস্থাপনার কারণে ২টি এফ-২৮ এয়ার ক্রাফ্ট ক্রয়ে বিমানের আর্থিক ক্ষতি ৯,৬৭,৯৯৮ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ ৪,৪২,৩৬,৮৪১ টাকা।

বিবরণ :

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলইনস্ কর্তৃক ২টি এফ-২৮ বিমান (S2-ACV ও S2-ACW) ক্রয়ের নথি পর্যালোচনায় নিম্নে বর্ণিত অসংগতি পরিলক্ষিত হয় :

- ১৭-০২-১৯৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪/৯৮তম পর্ষদ সভার সিদ্ধান্তে আলোকে ২টি এফ-২৮ উড়োজাহাজ ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয় এবং ১০টি দরপত্র কারিগরি মূল্যায়নের পর সিডিউলের ন্যূনতম শর্ত ৭৫% আবশ্যকীয় শর্ত পালনে সক্ষম বিবেচনায় ৬টি অফার গ্রহণযোগ্য হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ১টি দরদাতা তার অফার প্রত্যাহার করায় ৫টি আর্থিক অফার মূল্যায়ন করা হয়।
- দরপত্রের মেয়াদ ৯০ দিন থাকায় ১০-০৬-১৯৯৮ খ্রি. তারিখে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু আর্থিক অফারের ওপর ২৯-০৬-১৯৯৮ খ্রি. তারিখে আর্থিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রদান করায় দেখা যায়, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছে।
- আর্থিক মূল্যায়নে মেসার্স এয়ার ক্রাফ্ট ফাইন্যান্সিং অ্যান্ড ট্রেডিংয়ের ৪৪,০০,০০০ মার্কিন ডলারের দর ১ম সর্বনিম্ন এবং M/S Fortis Group-এর ৫৩,৬৭,৯৯৮ মার্কিন ডলারের দর হয় সর্বনিম্ন হয়।
- দরপত্রের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে দরপত্রের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য দরদাতাদের পত্র না দিয়ে মেয়াদ শেষ হওয়ার ৮/১০ দিনপর পত্র দেয়া হয়। সর্বনিম্ন দরদাতার দর অফারের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে অপারগতা প্রকাশ করে। প্রথম সর্বনিম্ন দরদাতা ও দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতার দর পার্থক্য মার্কিন ডলার ৯,৬৭,৯৯৮ এবং দরপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ কোনো দরপত্র আহ্বান করেনি। বরং ২৬-১১-১৯৯৮ খ্রি. তারিখে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় পত্রের মাধ্যমে ২য় সর্বনিম্ন দরদাতার দর গ্রহণ করে ক্রয়ের অনুমোদন প্রদান করে এবং ২য় সর্বনিম্ন দরদাতা M/S Fortis Group-এর সঙ্গে ০২-০২-১৯৯৯ খ্রি. তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়।

অডিট প্রতিবেদনে সরকারি ক্রয়ে অনিয়মের তথ্য যেভাবে থাকে

ক্রয়-প্রক্রিয়া উত্তর প্রতিবেদন

সরকারি ক্রয়-প্রক্রিয়া সঠিকভাবে করা হয়েছে কি না, ক্রয় আইন বা বিধির সঙ্গে তার কোনো ব্যত্যয় হয়েছে কি না—এইসব তথ্য জানার অত্যন্ত কার্যকর দলিল হলো ক্রয়-প্রক্রিয়া উত্তর প্রতিবেদন। এটি সিপিটিইউ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রণয়ন করে থাকে। এই প্রতিবেদন থেকে ক্রয়-প্রক্রিয়ায় সংঘটিত অনিয়মের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যাবে, যা রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

তথ্য অধিকার আইন

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন একটি নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে। প্রাত্যহিক সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইনটি বিশেষ কার্যকর না হলেও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য অনেক বড় আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করতে তথ্য অধিকার আইন প্রধান সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

যেমন, সরকারি ক্রয় নিয়ে প্রতিবেদন তৈরির সময় অনেক ক্ষেত্রেই টেন্ডার বা দরপত্রসংক্রান্ত তথ্য পেতে কষ্ট হয়। দুর্নীতি বা অনিয়ম আছে, এমন প্রকল্পের ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা তথ্য দিতে রাজি হন না বা তথ্য গোপন করেন। এমন পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় দলিল বা তথ্য সংগ্রহের জন্য তথ্য অধিকার আইন কাজে লাগানোর সুযোগ আছে।

সাধারণভাবে এই আইন অনুযায়ী চলমান অথবা এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি, এমন সরকারি কেনাকাটা সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু ক্রয়সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবার পর কিংবা প্রক্রিয়া শেষ হবার পর, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে তথ্য দিতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রে আইনের নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে আবেদন করলে কর্তৃপক্ষ এ-সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করবে।

শুধু আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান নয়। স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রদানের বিধানও তথ্য অধিকার আইনে রয়েছে। আইনের ৬ (১) ধারায় প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের ওপর তার গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সকল তথ্য নাগরিকগণের কাছে সহজলভ্য হয় এরূপ সূচিবদ্ধ করে প্রকাশ বা প্রচার করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। ক্রয়-প্রক্রিয়া শেষ হওয়া বা এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হওয়ার পর থেকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে এ-সংক্রান্ত সব তথ্য নিজে থেকেই সূচিবদ্ধ করে এমনভাবে প্রকাশ করতে হবে, যাতে জনসাধারণ তা সহজে পেতে পারে।

একইভাবে কোনো কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ কোনো নীতি প্রণয়ন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ওই সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করবে এবং সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমর্থনে যুক্তি ও কারণ ব্যাখ্যা করবে।

তথ্য অধিকার আইনের এই ধারার কারণে ক্রয়-পরিকল্পনা, টেন্ডার বা দরপত্রসংক্রান্ত তথ্য-প্রতিবেদন, টেন্ডার ডকুমেন্ট, কারা কাজ পেয়েছে, কেন পেয়েছে, কাজ শুরুর পর চুক্তিতে কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি না, কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে—এমন সব তথ্য সাংবাদিকরা

পেতে পারেন। এ ধরনের তথ্য চেয়ে তাঁরা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে আবেদন করতে পারবেন। না পেলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল, অসন্তুষ্ট হলে তথ্য কমিশনে নালিশও জানাতে পারবেন।

সরকারি ক্রয় আইনে দরপত্র জমা, প্রক্রিয়া ও ফলাফল সম্পর্কে শুধু আগ্রহী বিডার বা দরদাতাকে তথ্য দেয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তথ্য অধিকার আইনে তাদের পাশাপাশি সব নাগরিকের জন্য এ ধরনের তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এভাবে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে ক্রয় আইনের সীমাবদ্ধতা কিছুটা হলেও কমেছে।

এভাবে শুধু সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া নয়, সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনার অন্য যেকোনো বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য তথ্য অধিকার আইন হতে পারে একটি কার্যকর হাতিয়ার।

অন্যান্য

সরকারি আয়-ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রতিবেদনের জন্য বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান আছে, যাদের দেয়া তথ্য কাজে লাগতে পারে। যেমন : বাংলাদেশ ব্যাংক। সরকার কত টাকা ঋণ নিচ্ছে, এই ঋণ নেয়ার ধরন অন্যান্য বছরের তুলনায় কেমন অথবা এর প্রতিক্রিয়া বুঝতে চাইলে, এই প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যেতে পারে। একইভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিসংখ্যান বা অডিট প্রতিবেদনগুলো থেকে সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়, যা সরাসরি সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনার সঙ্গেও জড়িত।

সরকার কেমন আয় করছে, বিশেষ করে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হবে কি হবে না, কর বা শুল্ক ফাঁকি—এ ধরনের তথ্য পেতে যেতে হবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআরে। একইভাবে সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনার সুফল বা প্রতিক্রিয়া বুঝতে সহায়ক, সামষ্টিক অর্থনীতির এমন অনেক তথ্যের সূত্র হতে পারে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

দরপত্রে অংশ নিয়ে হেরে যাওয়া প্রতিষ্ঠান অনেক সময়ই সরকারি কেনাকাটা নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির জন্য তথ্যের বড় সূত্র হিসেবে কাজ করে। এ ক্ষেত্রে তারা নিজে থেকেই অনেক তথ্য দিতে আগ্রহী হয়, যা অনেক সময় প্রতিবেদনের মোড়ও ঘুরিয়ে দিতে পারে। তবে এ ধরনের তথ্যের সঙ্গে স্বার্থের বিষয়টি সরাসরি জড়িত থাকায়, প্রতিবেদককে তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে।

এ ছাড়া রয়েছে সিপিটিইউ-এর ওয়েবসাইট (www.cptu.gov.bd) এবং ইজিপি ওয়েবসাইট (www.eprocure.gov.bd)। ইজিপি ওয়েবসাইট থেকে একটি টেন্ডারে কতজন অংশগ্রহণকারী ছিল, কতজন ডকুমেন্ট ক্রয় করেও দরপত্র জমা দেয়নি, তার তথ্য পাওয়া যাবে। সে ক্ষেত্রে ঝামেলামুক্ত পরিবেশে দরপত্র জমা দেয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন দরপত্রটি প্রতিযোগিতামূলক হলো না—সে সম্পর্কে অনুসন্ধানের সুযোগ রয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

যে সকল আইন জানা প্রয়োজন

সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যেকোনো বস্তুনিষ্ঠ ও অনুসন্ধানধর্মী প্রতিবেদন তৈরি করতে গেলে এ-সংক্রান্ত আইনগুলো জানা বা সংগ্রহে থাকা প্রয়োজন। কোন আইনে ক্রয় বা প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষমতা কাকে দেয়া হয়েছে, কোন ধরনের প্রকল্প মন্ত্রণালয় নিজেই অনুমোদন দিতে পারে, কেমন ক্রয় আদেশের জন্য মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন লাগে, কোন পর্যায়ের কর্মকর্তা কত টাকা পর্যন্ত ছাড় করতে পারেন, কখন উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক টেন্ডার করতে হবে, কখন ক্লোজড বা বন্ধ টেন্ডার আহ্বান করা যাবে, কেনাকাটায় স্বচ্ছতার জন্য কী বিধান আছে—এমন সব বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা কেবল আইনেই আছে।

কেনাকাটায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ঠিকাদারেরা সাধারণত প্রভাবশালী, পেশাদার বা দক্ষ হয়ে থাকে। বিভিন্ন বহুজাতিক বা বিদেশি কোম্পানিও বাংলাদেশের ক্রয়-প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। আর দেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক যোগাযোগ বা সামাজিক প্রতিষ্ঠা আছে এমন ব্যক্তির মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এ ধরনের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পেশাদার আইনজীবী ও বিশেষজ্ঞরাও থাকেন। তাই এ বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরির সময় যেমন যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হয়, তেমনি কোন আইনের কোন শর্ত কোথায় বরখেলাপ হয়েছে সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণাও থাকা জরুরি, যাতে বড় ধরনের ভুল বা আইনি জটিলতা এড়ানো যায়। একইভাবে কারো দুর্নীতি বা অনিয়ম প্রমাণিত হলে তিনি কোন আইনে দোষী, এ ক্ষেত্রে শাস্তি কী—এসব বিষয়ও আইনেই সুস্পষ্টভাবে বলা আছে। তাই নিচে এ-সংক্রান্ত আইন, বিধি বা আদেশের একটি তালিকা দেয়া হলো। বাংলাদেশের সব আইনের কপি http://bdlaws.minlaw.gov.bd/ এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়।

সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯

সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানার জন্য এই আইন সবচেয়ে কার্যকর। সরকারের আর্থিক বা বাজেট-ব্যবস্থাপনা কেমন হবে, কীভাবে ঋণ নেয়া হবে, কত টাকা ঋণ নেয়া যাবে, ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে রাখার বাধ্যবাধকতা, অর্থ বণ্টনের ক্ষেত্রে সমতা, স্বচ্ছতার জন্য পরিবীক্ষণ অথবা আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অসদাচরণের সংজ্ঞা—এমন সবকিছুর ব্যাখ্যা এই

আইনে রয়েছে। এটি সরকারি অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ, সম্পদ সংগ্রহ থেকে বণ্টন, সংযুক্ত তহবিলে অর্থ প্রদান বা প্রত্যাহার, প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে অর্থ প্রদান বা প্রত্যাহার এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব বিষয় সম্পর্কিত আইন।

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ও বিধি

সরকারি তহবিলের টাকা দিয়ে কোনো পণ্য, সেবা বা কাজ কেনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য এই আইন প্রণীত হয়। সবার প্রতি সম-আচরণ এবং অবাধ প্রতিযোগিতার মূলনীতিকে সামনে রেখে সরকারি ক্রয়ের জন্য কী করতে হবে তার সুস্পষ্ট বিবরণ এই আইনে আছে। ২০০৯ সালে এই আইন সংশোধন করে সেখানে ২ কোটি টাকা পর্যন্ত কাজের জন্য অভিজ্ঞতা শিথিলসহ বেশ কিছু সংশোধনী আনা হয়।

এই আইনের ভিত্তিতে ২০০৮ সালে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা তৈরি হয়। এই আইন ও বিধিতে কীভাবে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করতে হয়, ঠিকাদারের যোগ্যতা, বাছাই ও মূল্যায়ন-প্রক্রিয়া, প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার পদ্ধতি, টাকা পরিশোধ থেকে শুরু করে চুক্তি বাতিল, অভিযোগ দায়ের—এমন সব বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। কখন উন্মুক্ত দরপত্র, কখন সীমিত দরপত্র, কখন সরাসরি ক্রয় করা যাবে, এসব বিষয়ও বিধিতে রয়েছে। এই আইন ও বিধিতে আইন ভঙ্গকারীর জন্য শাস্তির বিধানও রয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪

দুর্নীতি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিশদ একটি ধারণা। সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয় দুর্নীতি, এ ক্ষেত্রে সাজার বিধান কী—এমন সব বিষয় পাওয়া যাবে দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে। ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি বা দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী, দুদক আইনে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত কিছু অপরাধকে তফসিলভুক্ত করা হয়েছে। নিচে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো :

- দণ্ডবিধি, ১৮৬০
- ধারা-১০৯ : দুষ্কর্মে সহায়তা।
- ধারা-১২০-ক : অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের সংজ্ঞা।
- ধারা-১২০-খ : অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের শাস্তি ।
- ধারা-১৬১ : সরকারী কর্মচারী কর্তৃক কোনো সরকারী কার্য সম্পর্কে বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত অন্যবিধ বকশিশ গ্রহণ।
- ধারা-১৬২ : অসাধু বা অবৈধ উপায়ে সরকারি কর্মচারীকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে বকশিশ গ্রহণ।
- ধারা-১৬৩ : সরকারী কর্মচারীর প্রতি ব্যক্তিগত প্রভাব প্রয়োগের জন্য বকশিশ গ্রহণ।
- ধারা-১৬৫ : সরকারী কর্মচারী কর্তৃক অনুরূপ সরকারী কর্মচারী কর্তৃক পরিচালিত মোকদ্দমা বা ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট থেকে বিনা মূল্যে মূল্যবান বস্তু গ্রহণ।
- ধারা-১৬৬ : কোনো ব্যক্তির ক্ষতিসাধনকল্পে সরকারী কর্মচারী কর্তৃক আইন অমান্যকরণ।

- ধারা-১৬৭ : ক্ষতিসাধনকল্পে সরকারী কর্মচারী কর্তৃক কোনো অশুদ্ধ দলিল প্রণয়ন।
- ধারা-১৬৮ : সরকারী কর্মচারী বেআইনীভাবে ব্যবসায়ে নিয়োজিত হওয়া।
- ধারা-১৬৯ : সরকারী কর্মচারী বেআইনীভাবে সম্পত্তি ক্রয় বা নিলামের দর হাঁকা।

কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল আইন ও অধ্যাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল' (সিএজি) পদ সৃষ্টির বিধান রাখা হয়। সংবিধানের ১২৭-১৩২ অনুচ্ছেদে সিএজি কার্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং সাংবিধানিক নিরীক্ষার দায়িত্ব পালন বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ ধারা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের হিসাব নিরীক্ষার দায়িত্ব সিঅ্যান্ডএজি-কে প্রদান করেছে। সিঅ্যান্ডএজিকে সংসদে প্রতিবেদন জমা দিতে হয়। প্রজাতন্ত্রের ও কোর্ট অব ল'-এর হিসাব, অন্যান্য কর্তৃপক্ষ ও সরকারি অফিসারদের হিসাব সিঅ্যান্ডএজি-কে নিরীক্ষা করতে হয়। এই উদ্দেশ্যে তার অথবা তার অনুমোদিত অন্য কোনো প্রতিনিধির সব হিসাব বই, ভাউচার, দলিল, নগদান, স্ট্যাম্প, সিকিউরিটিজ, গুদাম ও অন্যান্য সরকারি সম্পত্তি দেখার অধিকার আছে। কাজ চালানোর ক্ষেত্রে সিঅ্যান্ডএজি কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ নন। সংবিধান কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং অধীনস্থ ১০ জন ডাইরেক্টর জেনারেলের সহায়তায় তিনি সরকারি সব বিভাগ, এজেন্সি, পাবলিক সেক্টর করপোরেশন এবং যেসব পাবলিক কোম্পানিতে সরকারের ৫০% মালিকানা আছে তার নিরীক্ষা করে থাকেন।

এই আলোকেই প্রণীত হয় কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল আইন ও অধ্যাদেশ। ১৯৭৪ সালে আইনটি প্রণয়নের পর কয়েক দফা সংশোধন আনা হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৮৩ সালে অধ্যাদেশটি জারি করা হয়। অডিট দপ্তরের ক্ষমতা, তাদের কাজের পরিধি, অনিয়মের ধরন—এসব বিষয় সম্পর্কে ধারণা পেতে আইনটি জানা দরকার।

আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ও পুনঃ অর্পণ ক্ষমতা আদেশ

সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রতিবেদন তৈরির জন্য জানা দরকার কোন পর্যায়ের কর্মকর্তা কত টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারেন। পণ্য বা সেবা কেনা, পরামর্শক নিয়োগ, উন্নয়ন-কাজের ঠিকাদার নিয়োগ থেকে শুরু করে সরকারি পণ্য বিক্রি পর্যন্ত সব ধরনের আর্থিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে পদমর্যাদা অনুযায়ী ক্ষমতা বন্টন করা থাকে। এজন্যই অর্থ মন্ত্রণালয় আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ও পুনঃ অর্পণ ক্ষমতা আদেশ প্রণয়ণ করে থাকে। সময়ের সঙ্গে সংগতি রেখে কয়েক বছর পর পদ অনুযায়ী কেনাটাকার ক্ষমতা বাড়িয়ে এই আদেশ সংশোধন করা হয়।

নিচের ছবিতে সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্ষমতার ধরন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। একইভাবে কোন পর্যায়ের কর্মকর্তা কত টাকা পর্যন্ত কাজ টেন্ডার ছাড়া করাতে পারবেন, কোন আকার এবং ধরনের জন্য কেনাকাটার শর্ত—কী এসব বিষয়ও এই আদেশে আছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট http://www.mof.gov.bd/en/budget/ebook/chpt-1-fin-power.pdf এই দলিল পাওয়া যাবে।

ক্রমিক নং	ক্রয়/সংগ্রহের ধরন ও অনুমোদকারী কর্তৃপক্ষ	আর্থিক ক্ষমতা	
		উন্নয়ন খাত	অনুন্নয়ন খাত
ক. সকল পূর্তকাজ/ পণ্য মালামাল/ যন্ত্রপাতি ক্রয়/ সম্পাদনের ক্ষেত্রে			
১)	ছোট করপোরেশন/ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/ আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস বা সমপর্যায় (ক্রমিক নং-২ এ উল্লেখিত সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যতীত এ ধরনের অন্য সকল করপোরেশন/ সংস্থা)	২০ কোটি টাকা পর্যন্ত	২০ কোটি টাকা পর্যন্ত
২)	বড় করপোরেশন/ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/ আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস বা সমপর্যায়, যথা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড/ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন শিল্প সংস্থা/ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন/ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা/ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড/ ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ/ ঢাকা ওয়াসা/ ঢাকা সিটি করপোরেশন/ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ/ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।	২৪ কোটি টাকা পর্যন্ত	২৪ কোটি টাকা পর্যন্ত
৩)	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ (মন্ত্রী/ উপদেষ্টা পর্যায়)	৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত	৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত
৪)	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা/ উপদেষ্টা কমিটি	৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বে	৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বে
খ. পরামর্শক সেবা (কনসালটেন্সি সার্ভিসেস) গ্রহণ :			
১)	ছোট করপোরেশন/ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/ আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস বা সমপর্যায় (উপরের ক (১)-এর অনুরূপ)	৪ কোটি টাকার উর্ধ্বে	৪ কোটি টাকার উর্ধ্বে
২)	বড় করপোরেশন/ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/ আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস বা সমপর্যায় (উপরের (২) এর অনুরূপ)	৪ কোটি টাকা পর্যন্ত	৪ কোটি টাকা পর্যন্ত
৩)	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ (মন্ত্রী/ উপদেষ্টা পর্যায়)	১০ কোটি টাকা পর্যন্ত	১০ কোটি টাকা পর্যন্ত
৪)	সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা/ উপদেষ্টা কমিটি	১০ কোটি টাকার উর্ধ্বে	১০ কোটি টাকার উর্ধ্বে

আর্থিক ক্ষমতার বণ্টন

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

সরকারি ক্রয়বিধির অনেক সীমাবদ্ধতা দূর করেছে তথ্য অধিকার আইন; বিশেষ করে, সরকারি কোনো কাজের দরপত্রসংক্রান্ত তথ্য এবং অভিযোগের ক্ষেত্রে। এই আইনের কয়েকটি ধারা ক্রয়সংক্রান্ত তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ, তথ্য চাওয়া এবং পাওয়ার অধিকার এবং অভিযোগের ক্ষেত্রে সার্বজনীনতা দিয়েছে। এ সম্পর্কে আগের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়

সংবাদে সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনা

সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনা নিয়ে দেশের গণমাধ্যমে খবরের সংখ্যা নেহাত কম নয়। কমবেশি সব পত্রিকা বা সম্প্রচারমাধ্যমই এ ধরনের খবর গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ বা প্রচার করে থাকে। পত্রিকার কথাই ধরা যাক। বাংলা ও ইংরেজি মিলিয়ে দেশের বহুল প্রচারিত পাঁচটি পত্রিকার উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২০১৩ সালে এই বিষয়ে মোট ১৭৬টি খবর ছাপা হয়েছে। ইংরেজির চেয়ে বাংলা পত্রিকায় এ-জাতীয় খবর বেশি। সেই তুলনায় টেলিভিশনে সরকারি তহবিল নিয়ে প্রতিবেদনের সংখ্যা কম।

প্রতিবেদনের ধরন

এক বছরে দেশের চারটি প্রথম সারির টেলিভিশনে এই বিষয়ে মোট ৭৫টি সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এই সংখ্যাকে বড় মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এর বেশিরভাগই প্রকল্প বা প্রস্তাব অনুমোদনসংক্রান্ত। সাধারণত, সরকারি ক্রয় বা অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি আর জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেকের বৈঠকে—প্রকল্প বা ক্রয়-প্রস্তাব অনুমোদনের খবরই এখানে বেশি। এর পরেই রয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন এবং দাতাদের পর্যবেক্ষণ।

আলোচ্য বছরটি পদ্মা সেতু প্রকল্প নিয়ে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে টানাপোড়েন, বিশেষজ্ঞ কমিটির সফর, দুদকে অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ—এমন সব কারণে ঘটনাবহুল ছিল। যার প্রতিফলন দেখা গেছে টিভির খবরে। মোদ্দা কথা হলো, সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনা নিয়ে টিভিতে প্রচারিত খবরগুলো মূলত দিনের ঘটনা (ডে-ইভেন্ট)-কেন্দ্রিক। সেখানে অনুসন্ধানধর্মী বা গভীরতা আছে (ইন-ডেপথ) এমন প্রতিবেদনের সংখ্যা হাতে-গোনা, যা নিচের চিত্রে আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে।

পত্রিকায় দৈনন্দিন ঘটনার তুলনায় অনুসন্ধান অথবা বিশ্লেষণধর্মী খবর বেশি ছাপা হয়। বিষয়বস্তু বিচারে এখানেও প্রকল্প অনুমোদন বা টাকা ছাড়ের সংবাদ বেশি। কিন্তু সরকারি কেনাকাটার অবস্থান এর খুব কাছাকাছি। বাজেট-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত এবং পদ্মা সেতুর কারণে

দুর্নীতি দমন কমিশন গুরুত্ব পেলেও মহাহিসাব নিরীক্ষকের কার্যালয় কিংবা সরকারি হিসাবসংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির খবর নেহাতই নগণ্য।

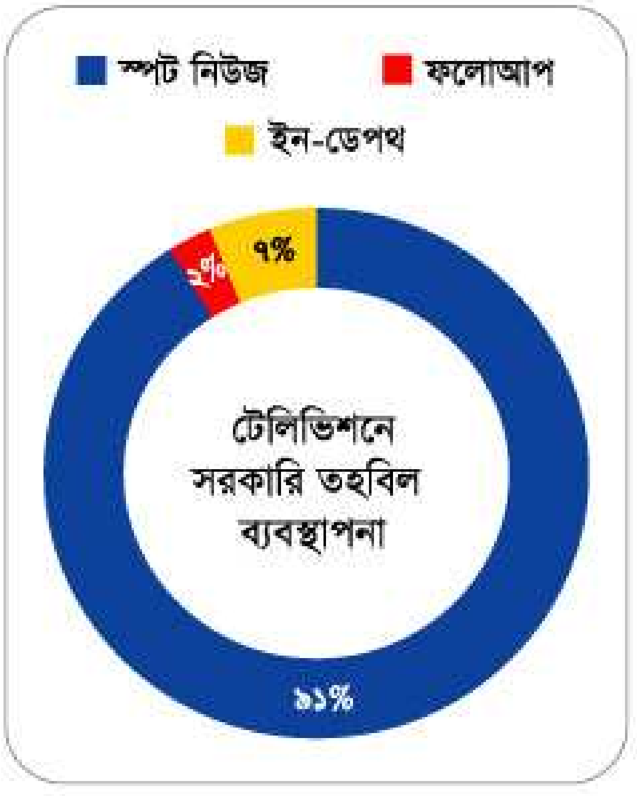

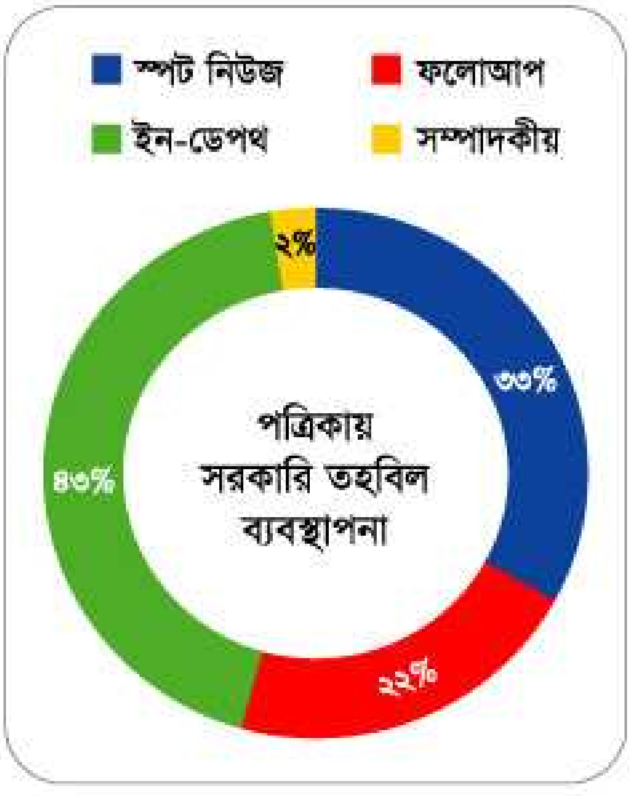

খবরে সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনা

গুরুত্ব

গণমাধ্যমে সরকারি তহবিলসংক্রান্ত খবর মোটামুটি গুরুত্ব পায়। তথ্য বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, এ-জাতীয় খবরের অর্ধেকই ছাপা হয়েছে প্রথম অথবা শেষের পাতায়। টিভির ক্ষেত্রেও সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনাবিষয়ক খবরগুলোর ৭৩ ভাগ বুলেটিনের প্রথম ভাগে জায়গা করে নিয়েছে। তবে সম্পাদকীয় নীতিমালায় যে এই বিষয়টি এখনো ততটা দাগ কাটতে পারেনি, তার প্রমাণ হলো, এই বিষয়ে ছাপা সংবাদের মাত্র ৩ শতাংশ এসেছে সম্পাদকীয় ও মতামত পাতায়।

বিষয়বস্তু

মূল বিষয়বস্তু বা ফোকাস বিবেচনা করলে ছাপা ও সম্প্রচারমাধ্যমে আসা প্রতিবেদনে গুণগত পার্থক্য ধরা পড়ে। পত্রিকার খবরগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সরকারি তহবিল খরচে দুর্নীতি বা প্রকল্পের ফলাফল মূল্যায়ন নিয়ে। আর ডে ইভেন্ট-নির্ভরতার কারণে টিভিতে ঘোষণা বা ডিসক্লোজার (সরকারি সিদ্ধান্ত, মন্ত্রীর মতামত, চুক্তি স্বাক্ষর) জাতীয় সংবাদই বেশি থাকে। টিভিতে দুর্নীতির খবর থাকলেও তা যতটা না অনুসন্ধানধর্মী তার চেয়ে অনেক বেশি দুর্নীতি সম্পর্কে কারো মন্তব্য বা অভিযোগকেন্দ্রিক। দুই মাধ্যমেই সরকারি ব্যয়ে দুর্নীতি নিয়ে আগ্রহ বেশি। কিন্তু সরকারি আয় ব্যবস্থাপনার বিষয়টি মূলত রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি বা কর ফাঁকির কিছু খবরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিদেশি সাহায্য প্রাপ্তি বা সরকারের

ব্যাংক ঋণ বেড়ে যাওয়া নিয়েও মোটা দাগে গতানুগতিক কিছু প্রতিবেদন ছাপা হয়। কিন্তু আয় ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা বা অর্থনীতিতে এর প্রতিক্রিয়ার মতো বিষয় নিয়ে ইন-ডেপথ প্রতিবেদন খুবই কম দেখা যায়। অথচ সামষ্টিক অর্থনীতিতে ভারসাম্য রক্ষার জন্য বিষয়টি খুবই জরুরি।

প্রতিবেদন কতটা বস্তুনিষ্ঠ

সরকারি অর্থের ব্যবহার নিয়ে প্রতিবেদনে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য থাকা খুবই জরুরি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, পাঁচটি পত্রিকায় এক বছরে ছাপা হওয়া খবর বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ৭০ ভাগ প্রতিবেদনেই কমবেশি সীমাবদ্ধতা আছে। যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য নিচে তুলে ধরা হলো।

- ৪০ শতাংশ প্রতিবেদনেই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মতামত নেয়া হয়নি। কখনো অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা মতামত দিতে রাজি হননি বলে এড়িয়ে গেছেন প্রতিবেদক, কখনো বা মতামত নেয়ার চেষ্টাই করা হয়নি। এই প্রবণতা প্রতিবেদনকে দুর্বল করে এবং পাঠকের মনে বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন জন্ম দেয়।
- বস্তুনিষ্ঠতায় আরেকটি বড় সমস্যা হলো : অস্পষ্ট সোর্স বা তথ্যসূত্র। শতকরা ৩৫ ভাগ খবরে প্রতিবেদক যে তথ্য ব্যবহার করেছেন তার সূত্র উল্লেখ নেই। কোনোটিতে 'সূত্র জানায়' বলে একটি গুরুতর তথ্য দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেই সূত্রের গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, এমন কোনো বিবরণ নেই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্র থাকতেই পারে। কিন্তু নাম গোপন রেখে হলেও তাঁকে এমনভাবে প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠিত করা জরুরি, যাতে তথ্য তার বিশ্বাসযোগ্যতা না হারায়। তাই নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্র যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করাই উচিত। শেষ পর্যন্ত তথ্যের সূত্র যতটা বিশ্বাসযোগ্য, প্রতিবেদনও পাঠকের কাছে ততটাই বস্তুনিষ্ঠ।

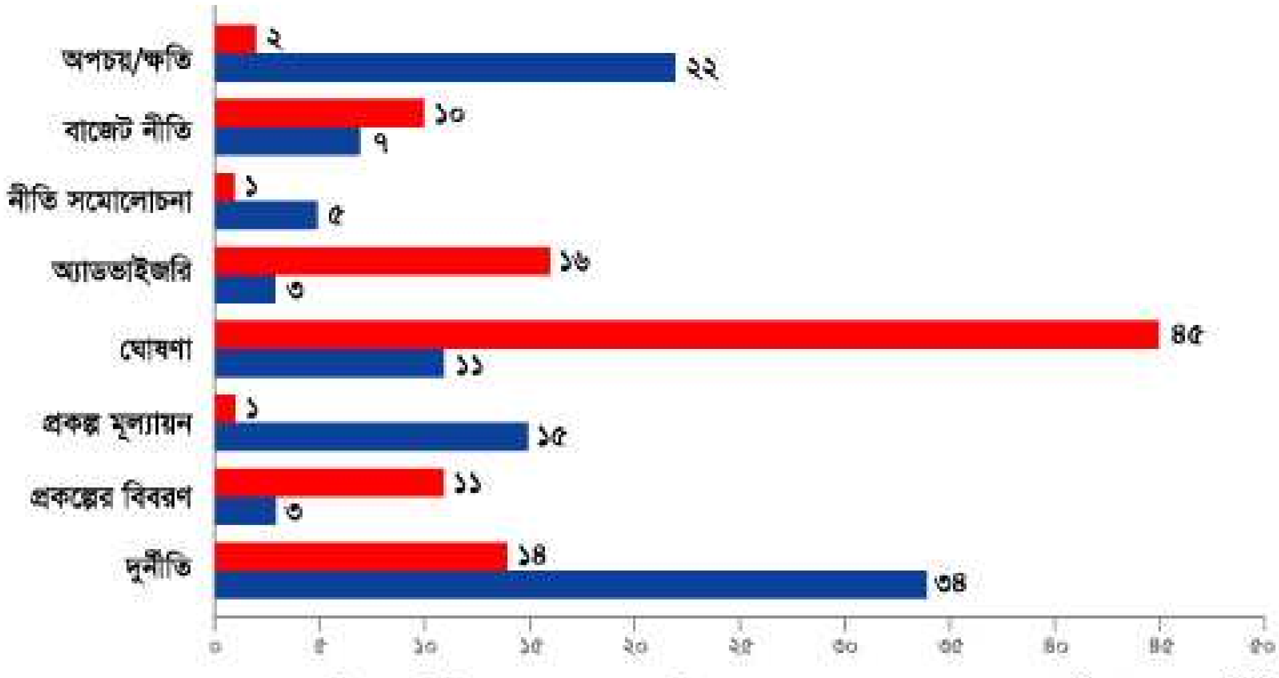

ফোকাস : পত্রিকা ও টিভির মধ্যে তুলনা (প্রকাশিত খবরের % হারে)

- সরকারি ক্রয়ে দুর্নীতি, অনিয়ম বা অপচয় নিয়ে প্রতিবেদনের জন্য সরেজমিন অনুসন্ধান বা দলিল-প্রমাণ থাকা খুবই জরুরি। কিন্তু ২০ শতাংশ প্রতিবেদনে দেখা গেছে, গুরুতর সব অনিয়মের তথ্য দেয়া হচ্ছে কেবল কয়েকজনের কাছ থেকে শোনা কথার ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু শুধু মানুষের অভিযোগই একটি বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদনের জন্য যথেষ্ট নয়। টেলিভিশনে এই সমস্যা আরো বেশি।

প্রতিবেদন কি স্পষ্ট

প্রতিবেদনে স্পষ্টতার জন্য কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি। তথ্যের মধ্যে কোনো স্ববিরোধিতা আছে কি না। প্রতিবেদনটি পাঠকের মনে তৈরি হতে পারে, এমন যৌক্তিক সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে কি না। লেখায় ঘটনার প্রেক্ষাপট, কারণ এবং অভিঘাত পরিষ্কারভাবে উঠে এসেছে কি না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, প্রকাশিত খবরগুলোতে ঘটনাটি কীভাবে ঘটল, কেন ঘটল এবং ঘটার কারণে কী হলো—এমন বিবরণে ফাঁক থেকে যায়। সেই সঙ্গে ঘটনাপ্রবাহের বিবরণে ধারাবাহিকতা থাকে না। ফলে মাঝ পর্যায়ে এসে পাঠক বা দর্শক এক রকমের ধাক্কা খান।

প্রতিবেদন কতটা সহজবোধ্য

সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনা বিষয়টি জটিল ও নীরস। এ নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করা তাই সব সময়ই চ্যালেঞ্জের। এই বিষয়ে ঝরঝরে প্রাঞ্জল একটি প্রতিবেদন লেখার সবচেয়ে বড় শর্ত হচ্ছে বিষয়বস্তুর সঙ্গে মানুষের জীবনের সম্পর্কটাকে দেখিয়ে দেয়া। হয়তো দুর্নীতি অনেক বড়, হয়তো লোকসানের অঙ্কটা আকাশছোঁয়া কিন্তু সেই সব বড় সংখ্যার পেছনে মানুষের ভোগান্তি বা ক্ষতির গল্পটা যদি না উঠে আসে, তাহলে পাঠক তাতে খুব একটা আগ্রহ খুঁজে পান না। এ ক্ষেত্রে সংখ্যার ব্যবহার হতে হবে পরিমিত, শব্দ হতে হবে সহজ আর বাক্য হতে হবে ছোট। একের পর এক অনুচ্ছেদ এমনভাবে সাজাতে হবে যেন মনে হয় সব মিলে একটা গল্প।

উদাহরণ : ১

স্থানীয় সরকার সহায়তা প্রকল্পের টাকা হরিলুট!

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলায় স্থানীয় সরকার সহায়তা প্রকল্পের (এলজিএসপি) টাকা লুটপাট করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রের ভাষ্যমতে, এসব প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা অর্থ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় থেকে সরাসরি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ব্যাংক হিসাবে পাঠানো হয়। আর এ সুযোগে কোনো কোনো প্রকল্পের আংশিক বাস্তবায়ন বা কোনোটির কোনো কাজ না করেই উপজেলার ছয়টি ইউনিয়নের নামে আসা অর্থের বেশির ভাগ ব্যাংক থেকে তুলে আত্মসাৎ করা হয়েছে। অথচ কাগজে-কলমে এসব প্রকল্প শত ভাগ বাস্তবায়ন দেখানো হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ২০১১-১২ অর্থবছরে হোসেনপুর উপজেলার ছয়টি ইউনিয়নে এলজিএসপি-২ প্রকল্পের জন্য ৭১ লাখ ১৬ হাজার ৩৫৬ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। স্থানীয় সরকারব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণের জন্য বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে এ বরাদ্দ আসে।

সূত্রমতে, বিধিমালা অনুযায়ী, মাইকিং করে অথবা ঢোল পিটিয়ে সভা আহ্বান করে ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিটি গঠনের মাধ্যমে জনসাধারণের মতামতের ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণের কথা রয়েছে। কিন্তু এ উপজেলায় তা করা হয়নি। ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যরা কঠোর গোপনীয়তায় মনগড়াভাবে প্রকল্প তৈরি করেছেন।

সূত্রের ভাষ্যমতে, ইউপি চেয়ারম্যানরা তাঁদের অনুগত সদস্যদের প্রকল্প কমিটির সভাপতি বানিয়ে কাজ না করেই ব্যাংক থেকে তুলে আত্মসাৎ করেছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, উপজেলার আড়াইবাড়িয়া ইউনিয়নের চর জামাইল বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র সংস্কার দেখিয়ে ৪০ হাজার টাকা তোলা হয়েছে। কিন্তু ওই এলাকায় কোনো বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের খোঁজ পাওয়া যায়নি। একই ইউনিয়নের ধূলজুরি ফিডার রোড থেকে দুই পুকুরের মধ্য দিয়ে আবদুল মজিদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মাটি ভরাট দেখিয়ে ৭৫ হাজার টাকা, ধনকুড়া গ্রামে কৃষিকাজের সেচ-পাম্পসহ বিভিন্ন বাড়ি ও প্রতিষ্ঠানে আর্সেনিকমুক্ত নলকূপ স্থাপনের জন্য দুই লাখ ৯৫ হাজার টাকা তোলা হলেও কোনো কাজ হয়নি।

সূত্রমতে, সিদলা ইউনিয়নের মেছেড়া বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সংস্কার ও পূর্ব মেছেরা ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় টিন (সিআই শিট) সরবরাহের জন্য এক লাখ ৪০ হাজার টাকা, আতকাপাড়া গ্রামে একটি আর্সেনিকমুক্ত নলকূপ স্থাপন ও মেছেড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে ঘাট পাকাকরণের কাজ দেখিয়ে ৮৩ হাজার টাকা তোলা হলেও বাস্তবে কোনো কাজ হয়নি। জিনারী ইউনিয়নের বীর হাজীপুর গ্রামে শামসুদ্দিনের বাড়ি থেকে ডিসি রোড পর্যন্ত রাস্তা পুনর্নির্মাণ দেখিয়ে ৬২ হাজার টাকা তোলা হয়েছে। কিন্তু কোনো কাজ না করেই পুরো টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

পুমদী, শাহেদল, গোবিন্দপুর ইউনিয়নেও বিভিন্ন প্রকল্প দেখিয়ে কাজ না করেই প্রকল্পের বেশির ভাগ টাকা ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যরা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

উপজেলার ছয়টি ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে এক ফুট ব্যাসের রিং পাইপ ও নলকূপ স্থাপন এবং স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার বিতরণ খাতে ৪৫ লাখ টাকা বরাদ্দ দেখানো হয়েছে। বাস্তবে কয়েকটি ইউনিয়নে পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা দামের হাতেগোনা কয়েকটি নলকূপ ও রিং পাইপ স্থাপন করে এবং সামান্য কিছু স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার বিতরণ করে বেশির ভাগ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

সিদলা ইউপি চেয়ারম্যান মো. কামরুজ্জামান, আড়াইবাড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান মো. খুর্শিদ উদ্দিন ও জিনারী ইউপি চেয়ারম্যান মো. আবদুল কুদ্দুস বলেন, এলজিএসপি প্রকল্পে কোনো অনিয়ম হয়নি। তবে কোনো কাজ হয়নি, এ রকম কয়েকটি প্রকল্প সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা কোনো জবাব দেননি। বক্তব্য জানতে ফোন করা হলে দুজন ইউপি চেয়ারম্যানের মুঠোফোন বন্ধ পাওয়া যায়। অপর ইউপি চেয়ারম্যান ফোন ধরেননি।

উপজেলা এলজিএসপি বাস্তবায়ন কমিটির তৎকালীন সদস্যসচিব হোসেনপুর উপজেলা প্রকৌশলী মো. আরজুল হক বলেন, 'আমাদের নামমাত্র কমিটিতে রাখা হলেও প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে ইউনিয়ন পরিষদ। এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে কোনো পরামর্শ করা হয়নি।' তিনি অবশ্য গত সপ্তাহে অন্যত্র বদলি হয়ে গেছেন।

উপজেলা এলজিএসপি কমিটির সভাপতি ও হোসেনপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'এলজিএসপি প্রকল্প বাস্তবায়নের অর্থ সরাসরি মন্ত্রণালয় থেকে ইউনিয়ন পরিষদের ব্যাংক হিসাবে পাঠানো হয়ে থাকে। ইউপি চেয়ারম্যানরাই প্রকল্প বাস্তবায়ন করে ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে আমাদের কিছুই করার থাকে না।' তিনি বলেন, তবে অনিয়ম হয়ে থাকলে খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মন্তব্য

প্রতিবেদন লেখার সময় হরিলুট, হাজার হাজার বা শত শত কোটি এ-জাতীয় অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ এ ধরনের শব্দ কোনো অর্থ বহন করে না।

পুরো প্রতিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্যের বেলায় সংশ্লিষ্ট সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে। এই অস্পষ্ট সূত্র প্রতিবেদনে তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করে। যত বেশি সম্ভব সূত্রের পরিচয় থাকা উচিত। একেবারেই সম্ভব না হলে, সেই সূত্রকে এমনভাবে লেখায় প্রতিষ্ঠিত করা উচিত যেন, মানুষ বুঝতে পারে তথ্যদাতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন তার পরিচয় প্রকাশ করা যাচ্ছে না।

একসঙ্গে সব অনিয়মের বিবরণ এবং তারপরে একসঙ্গে সব বক্তব্য। গল্পে অনুচ্ছেদগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা নেই। যা পাঠযোগ্যতার দিক থেকে প্রতিবেদনটিকে দুর্বল করেছে।

বলা হচ্ছে, বেশির ভাগ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ মানে কত? কারা টাকা তুলে নিয়েছে? অভিযোগ কাদের? কারা লাভবান হলো? কারা ক্ষতিগ্রস্ত হলেন? এমন অনেক প্রশ্নের জবাব প্রতিবেদনটিতে নেই। দুর্নীতির যে অভিযোগ করা হচ্ছে তার সপক্ষে দু-একটি দালিলিক প্রমাণের উদাহরণ থাকলে আরো বিশ্বাসযোগ্য হতো।

কোনো কাজের জন্য কার দায় কী তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সংশ্লিষ্ট সবার বক্তব্য উঠে আসেনি। কয়েক জনের বক্তব্য নেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কেউই কথা বলেনি। যাদের মতামত চাওয়া হয়েছে, তাদের সঙ্গে অভিযোগের সম্পর্ক কোথায়, সেই সূত্র অস্পষ্ট।

অনুচ্ছেদ এবং বাক্যগুলো বড় বড়। ভাষার ব্যবহার প্রাঞ্জল নয়। মফস্বল থেকে পাঠানো এই সংবাদটি পত্রিকার ন্যাশনাল ডেস্ক কর্মীরাও ঠিকমতো সম্পাদনা করেননি।

উদাহরণ : ২

দরপত্রে শর্ত জুড়ে এক প্রতিষ্ঠান থেকেই মিটার কিনছে পিডিবি!

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) চুরি ঠেকানোর উপযোগী মিটার কেনায় অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগকারীরা বলছেন, দরপত্রে বিশেষ শর্তারোপের মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানকে একচেটিয়া ব্যবসার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। তারা কয়েক গুণ বেশি দামে চার বছর ধরে মিটার সরবরাহ করছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, ২০০৮ সালে পিডিবির দরপত্রে মিটার সুনির্দিষ্টকরণের (স্পেসিফিকেশন) ক্ষেত্রে এমন কিছু শর্ত যুক্ত করা হয়েছে, যাতে শুধু এলঅ্যান্ডজি ব্র্যান্ডের মিটার দরপত্রে যোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে। যেমন শর্তে বলা হয়েছে, টার্মিনাল কভার খোলার পর লগ মেমোরি থাকতে হবে। এর বাইরে যত আধুনিক মিটারই হোক আর তার দাম যত কমই হোক না কেন, দরপত্রে যোগ্য হওয়ার সুযোগ নেই বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

এলঅ্যান্ডজি ব্র্যান্ডের এ মিটার বাংলাদেশে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কেসিজে অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস। গত পাঁচ বছরে এ প্রতিষ্ঠানটি পিডিবির ছয়টি দরপত্রের কাজ পেয়েছে। আরও দুটি প্রক্রিয়াধীন আছে। অভিযোগ রয়েছে, প্রতিষ্ঠানটি বেশি দামে পিডিবির কাছে মিটার বিক্রি করছে। পিডিবির নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ২০১০ সালে প্রতিটি মিটারের দাম পড়েছে ১৬৯ মার্কিন ডলার, ২০১১ সালে ১৪৯ দশমিক ৫০ ডলার ও ২০১২ সালে ১৩৭ দশমিক ৫০ ডলার।

সর্বশেষ ২১ মার্চ ১২ হাজার মিটার ক্রয়ের আরেকটি দরপত্রের আর্থিক দর খুলেছে কর্তৃপক্ষ। এ দরপত্র ডাকা হয়েছিল গত বছরের ১৮ অক্টোবর। এতে পাঁচটি প্রতিষ্ঠান অংশ নিলেও আগের মতোই ওই শর্তের কারণে একমাত্র কেসিজেই যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। যদিও অন্য প্রতিযোগীদের দর কেসিজের অর্ধেকেরও কম। এই দরপত্রে কেসিজি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস মিটারপ্রতি ১৩৭ দশমিক ৫০ ডলার প্রব করেছে। এতে ১২ হাজার মিটারের দাম পড়ছে ১৬ লাখ ৫০ হাজার ডলার বা ১৩ কোটি ২০ লাখ টাকা।

জানা গেছে, এলঅ্যান্ডজির তৈরি একই মিটার গত বছর ভারতের বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ দরপত্রের মাধ্যমে কিনেছে প্রতিটি ৪১ মার্কিন ডলারে। দেশে বিদ্যুৎ খাতের একমাত্র লাভজনক কোম্পানি ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) ও ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ইলেকট্রিক মিটার কিনেছে ৫৫ থেকে ৬৫ ডলারে।

গত ২১ মার্চ সাড়ে ১৩ হাজার মিটার কেনার জন্য আরও একটি দরপত্র জমা নিয়েছে পিডিবি। এ ক্ষেত্রেও একই শর্তের কারণে অন্য কোনো সরবরাহকারী যোগ্য বিবেচিত হবেন না। ডেসকো, ডিপিডিসি, পল্লী বিদ্যুৎ কিংবা আশপাশের আর কোনো দেশে মিটার কেনার ক্ষেত্রে এ রকম কোনো শর্ত দেওয়ার নজির নেই।

এই প্রক্রিয়ায় পারস্পরিক যোগসাজশে রাষ্ট্রের অর্থ বছরের জন্যই এ ধরনের শর্তারোপ করা হয়েছে বলে মনে করেন বিদ্যুৎ বিভাগের নীতি ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার সেলের সাবেক একজন কর্মকর্তা। তিনি বলেন, মিটারের টার্মিনাল কাভার খোলার প্রসঙ্গ খুবই ঠুনকো।

আধুনিক মিটার সবই সফটওয়্যারনির্ভর। তাই যেকোনো ধরনের টেম্পারিং ডেটাবেস থেকে ধরা পড়বে।

পিডিবির সংশ্লিষ্ট একাধিক কর্মকর্তা জানান, টার্মিনাল কভার না খুলেও মিটারের নিচের তার ওলট-পালট করে মিটার থামিয়ে রাখা বা গতি ধীর করে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আধুনিক সফটওয়্যারনির্ভর মিটারে যেকোনো তার ওলট-পালট করলে, তা ধরা পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এ ছাড়া ৩৫ কিলো ভোল্টের (কেভি) 'ভোল্টেজ গান' রয়েছে, যা দিয়ে মিটারের ওপর স্পার্ক করলেই মিটার বন্ধ হয়ে যায়। এ কারণে ৩৫ কেভি পর্যন্ত স্পার্ক প্রতিরোধের ক্ষমতাসম্পন্ন মিটার সরবরাহের বাধ্যবাধকতা দিয়েছে ভারত। কিন্তু পিডিবি এ শর্ত দেয় না। পিডিবির কেনা এলঅ্যান্ডজি মিটার সর্বোচ্চ ১০ কেভি স্পার্ক প্রতিরোধী। এর বাইরে দশমিক ২ টেসিল ক্ষমতাসম্পন্ন চুম্বক ওপরে বসিয়েও মিটার বন্ধ করা যায়। যেহেতু বাজারে ২ টেসিল ক্ষমতাসম্পন্ন চুম্বক পাওয়া যায়, তাই চুরি ঠেকাতে দশমিক ২ টেসিল পর্যন্ত চুম্বক প্রতিরোধের ক্ষমতার শর্ত দেওয়াটাকেও জরুরি মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। পিডিবির এসব দিকে নজর দিচ্ছে না।

তবে পিডিবির সদস্য (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মো. আবদুহু রুহুল্লাহ একটি প্রতিষ্ঠানকে একচেটিয়া সুযোগ দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, এ শর্ত ২০০৮ সালেই দরপত্রে যুক্ত করা হয়েছে। এ শর্ত সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরাই যুক্ত করেছেন।

মন্তব্য

প্রতিবেদনটি তথ্যগত দিক দিয়ে বেশ সমৃদ্ধ। ক্রয়-প্রক্রিয়ায় অনিয়মের একটি মৌলিক উদাহরণ এটি। মিটার কেনায় শর্ত আরোপের মাধ্যমে কেনাকাটায় প্রতিযোগিতার সুযোগকে নষ্ট করা এবং একটি প্রতিষ্ঠানকে একচেটিয়া ব্যবসার সুযোগ করে দেয়ার ঘটনাকে এখানে বেশ ভালোভাবেই তুলে আনা হয়েছে। একই সঙ্গে এই প্রতিবেদনে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে।

পুরো প্রতিবেদনের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে একটি শর্ত। যেখানে বলা হচ্ছে, মিটারে 'টার্মিনাল কভার খোলার পর লগ মেমোরি থাকতে হবে।' এই শর্তের কারণে একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান মিটার সরবরাহের সুযোগ পাবে, কারণ অন্য প্রতিষ্ঠানের মিটারে এই বৈশিষ্ট্য নেই। সমস্যা হলো, 'টার্মিনাল কভার' ও 'লগ মেমোরি'—দুটো শব্দই টেকনিক্যাল। একজন সাধারণ পাঠক এই শব্দের অর্থ না-জানাটাই স্বাভাবিক। একইভাবে কিলো ভোল্ট, ভোল্টেজ গান, স্পার্ক, টেসিল ক্ষমতাসম্পন্ন চুম্বক—এ-জাতীয় অনেক শব্দ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু এসব শব্দের অর্থ বুঝিয়ে বলা হয়নি। যা পাঠযোগ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রতিবেদনকে অনেকটাই দুর্বল করেছে। শেষ দিকে মিটার কেনার ক্ষেত্রে আরো কী ধরনের শর্ত আরোপ করা যায়, তার কিছু জটিল টেকনিক্যাল বিবরণ আছে। যা পাঠককে প্রতিবেদন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

প্রতিবেদনটিতে বিশেষ শর্ত আরোপের মাধ্যমে ক্রয়নীতি লঙ্ঘনের অভিযোগও আনা হয়েছে। কিন্তু ঠিক কোন নীতি কীভাবে লঙ্ঘন হলো সেই ব্যাখ্যা নেই। গণক্রয় নীতিমালার ১৫ ধারায় বলা হয়েছে, 'ক্রয়কারী, দরপত্রদাতাগণের মধ্যে পক্ষপাতহীন ও উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে, ক্রয়ের জন্য নির্দিষ্টকৃত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা, অথবা কার্য ও ভৌত সেবার কারিগরি বিনির্দেশ ও বর্ণনা প্রস্তুত করিবার সময় উহা যেন সীমাবদ্ধকর না হয় তাহার নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে। প্রতিযোগিতা সীমিত করিতে পারে এইরূপ কোনো শর্ত আরোপ করা যাইবে না।' এমন একটি বিবরণ দেয়া হলে প্রতিবেদনে নীতিমালা লঙ্ঘনের বিষয়টি স্পষ্ট হতো।

কেসিজে নামের কোম্পানিটি কত দফায় কতগুলো মিটার সরবরাহ করেছে, প্রতিটির দাম কত পড়েছে, সামনে তাদের কাছ থেকে আরো কতগুলো কেনার প্রক্রিয়া চলছে, এই মিটারের স্বাভাবিক দাম কত এমন সব তথ্যই প্রতিবেদকের কাছে ছিল। এসব তথ্যের ভিত্তিতে এই কোম্পানিকে কাজ দিতে গিয়ে সরকারের এ পর্যন্ত কত লোকসান হয়েছে, আরো কত লোকসান হতে যাচ্ছে, লোকসানের টাকা দিয়ে কী কী করা যেত—এ ধরনের হিসাব দেয়ার সুযোগ ছিল। তাহলে এই অনিয়মের ব্যাপকতা সম্পর্কে পাঠক একটি সহজ ধারণা পেত।

প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে, কেসিজে অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস বেশি দামে পিডিবির কাছে মিটার বিক্রি করছে। কিন্তু এই অভিযোগ কে করছে? বলা হয়েছে, একই মিটার গত বছর ভারতের বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ কিনেছে প্রতিটি ৪১ মার্কিন ডলারে। কিন্তু এই তথ্যের উৎস কী? যারা মন্তব্য দিয়েছেন, একজন ছাড়া কারোরই পরিচয় দেয়া হয়নি কেন? পাওয়ার সেলের সাবেক কর্মকর্তার পরিচয়ই বা কেন গোপন রাখতে হলো? এমন অনেক অস্পষ্টতা প্রতিবেদনটিকে দুর্বল করেছে বিশ্বাসযোগ্যতার দিক থেকে।

উদাহরণ : ৩

ল্যাপটপে লুটপাট

সরকারি কোম্পানির 'দোয়েল' ল্যাপটপ উৎপাদনের যন্ত্রপাতি আমদানিতে কল্পকাহিনীকে হার মানানো লুটপাট হয়েছে। হাজার ডলারের যন্ত্রপাতির মূল্য লাখ ডলার দেখিয়ে আমদানি করা হয়েছে। সে কারণে দেড় লাখ ডলারের পণ্যের মূল্য দেখানো হয় ১০ লাখ ৬ হাজার ৫৪০ ডলার। ৩০০ শতাংশ বেশি মূল্য দেখিয়ে আমদানি করা অর্থের ভাগবাটোয়ারা হয়েছে মালয়েশিয়ার পেনাং এবং নিউইয়র্কে। পেনাংয়ে এইচএসবিসি ব্যাংক এবং নিউইয়র্কের টিডি ব্যাংকের দুটি অ্যাকাউন্টে পৌনে চার লাখ ডলার লেনদেনের প্রমাণ মিলেছে, যার পুরোটাই ঘুষ হিসেবে দিয়েছে দোয়েল ল্যাপটপের তখনকার মালয়েশিয়ান অংশীদার টিএফটি টেকনোলজি গ্রুপ। উপরি আয়ের একটি বড় অংশ তখনকার টেলিযোগাযোগমন্ত্রী রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজুও পেয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছেন টিএফটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাইকেল ওয়াং।

তবে রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু অস্বীকার করেছেন এমন অভিযোগ; বরং টেলিফোন শিল্প সংস্থার (টেশিস) তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) তার নামে অপপ্রচার চালাচ্ছেন বলে উল্টো অভিযোগ করেন তিনি। বর্তমান টেলিযোগাযোগমন্ত্রী আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারে বিষয়টি তদন্ত করে দেখার কথা বললেও পরে আবার অনুরোধ করেছেন এ বিষয়ে কিছু না লেখার জন্য। তবে টেশিসের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তারা স্বীকার করেছেন, ল্যাপটপ উৎপাদনে লুটপাট হয়েছে। বিষয়টি অনেক পরে ধরতে পেরেছেন তারা। নিশ্চিত হয়েছে, মালয়েশিয়ার পেনাংয়ে এইচএসবিসি ব্যাংকে (হিসাব নম্বর ৩৭১২৭১৭৪৩৭১০) মোহাম্মদ ইকবালের নামে দুই লাখ ৯৯ হাজার ডলার জমা করে টিএফটি। গত বছরের ১১ জুলাই এই ডলার জমা করা হয়। এ-সংক্রান্ত টিটির (টেলিফোন ট্রানজেকশন) একটি কপি হাতে রয়েছে। একইভাবে নিউইয়র্কের টিডি ব্যাংকে সুইফট কোড পদ্ধতিতে (হিসাব নম্বর ০৩১১০১২৬৬) জমা করা হয় আরও ৭৫ হাজার ডলার। এই টাকা জমা হয় চৌধুরী অ্যাসোসিয়েটসের নামে। পৌনে চার লাখ ডলার দেওয়ার পর সেটি অবহিত করে একটি চিঠিও মোহাম্মদ ইকবালের ঢাকার অফিসে পাঠান মাইকেল ওয়াং। চিঠিতে মোহাম্মদ ইকবালকে ঢাকার মিলেনিয়াম হোল্ডিং লিমিটেডের এমডি হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

তবে গত এক সপ্তাহে কয়েকবার রাজধানীর রূপসী বাংলা হোটেল (শেরাটন) কমপেক্স মিলেনিয়াম হোল্ডিং লিমিটেডের অফিসে গিয়েও মোহাম্মদ ইকবালের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি। তার অফিস থেকে প্রতিবেদকের মোবাইল নম্বর রেখে দিয়ে 'যোগাযোগ করা হবে' বললেও কোনো সাড়া মেলেনি। ফলে অভিযোগের বিষয়ে মোহাম্মদ ইকবালের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

মাইকেল ওয়াং পরিষ্কার করে বলেছেন, টাকার ভাগ মন্ত্রী (রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু), অতিরিক্ত সচিব মো. রফিকুল ইসলামসহ আরও কয়েকজন পেয়েছেন। তার কয়েকটি ই-মেইলে তিনি বলেন, ল্যাপটপ উৎপাদনের জন্য নতুন করে গঠিত হওয়া কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) নাজিব হাসানকে পদ্ধতি বাতলে দিয়েছিলেন কীভাবে আমদানি করা যন্ত্রাংশের দাম বাড়াতে হবে। রফিকুল ইসলামের চাচাতো ভাই হিসেবে ওই কোম্পানির দায়িত্ব পান নাজিব। বেশ কিছুদিন আগে এ বিষয়ে তার সঙ্গে কথা হলেও বর্তমানে তিনি দেশের বাইরে রয়েছেন।

বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে মাইকেল ওয়াং এসব তথ্য সরকারকে অবহিত করেন। পরে একপর্যায়ে লুটপাটের বিষয় তদন্তের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) ফাইল পাঠানোরও সিদ্ধান্ত নিয়েছিল টেশিস কর্তৃপক্ষ। গত বছরের ১৯ ডিসেম্বর টেশিসের বোর্ড মিটিংয়ে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই সরিয়ে দেওয়া হয় এমডি মোহাম্মদ ইসমাইলকে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, বোর্ডে এমন সিদ্ধান্তের কারণেই মন্ত্রী রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে তদবির করে ল্যাপটপ প্রকল্প থেকে সরিয়ে দেন ইসমাইলকে। আবার পরের বৈঠকেই সিদ্ধান্ত বদলের সঙ্গে সঙ্গে কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়া হয় দুদকবিষয়ক অংশ।

এর আগে গত বছরের অক্টোবর-নভেম্বর থেকে দুর্নীতির খবর যখন বেরোতে থাকে, তখন থেকেই মোহাম্মদ ইসমাইলকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকেন মন্ত্রী। একই সময়ে ল্যাপটপ প্রকল্পের এসব দুর্নীতির অবৈধ অর্থ লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করে। এর মধ্যে

ঢাকায় বিভিন্ন পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা হয়েছে। তাদের বক্তব্যের অডিও রেকর্ডও রয়েছে। তা ছাড়া মাইকেল ওয়াংয়ের সঙ্গে এক বছর ধরে ইমেইল লেনদেনের মাধ্যমে পাওয়া গেছে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। এসব ইমেইলে ওয়াং জানান, তিনি নিজে একাধিক বাংলাদেশির অ্যাকাউন্টে মন্ত্রীর জন্য ডলার জমা করেছেন। তা ছাড়া সারওয়ান্ত সিং (ভারতীয় নাগরিক) নামে অন্য এক ব্যক্তির ব্যাংক অ্যাকাউন্টেও তাকে ডলার দিতে হয়েছে। তার বক্তব্যে তিনি আজিজ রহমান নামেও এক ব্যক্তির কথা বলেন। অনুসন্ধানে আরও অনেকেই লেনদেনের সঙ্গে আজিজ রহমানের নাম বলেন; কিন্তু তার পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

সম্প্রতি এক অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় ল্যাপটপে দুর্নীতির কথা স্বীকার করেন রফিকুল ইসলাম। একই সঙ্গে তিনি টেশিস বোর্ডের সদস্য। তিনি বলেন, ওয়াংয়ের অভিযোগ সত্য হতেও পারে। তবে এর সঙ্গে নিজের ও মন্ত্রীর সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি অস্বীকার করে তিনি বলেন, প্রকল্প পরিকল্পনার সময়ই সমস্যা ছিল। ১০ লাখ ডলারের প্রকল্প ব্যয় ১৮ লাখ ডলার ধরা হয়। একই সঙ্গে তিনি বলেন, ওয়াং নিজে দুর্নীতিবাজ। তাকেই তো আগে ধরা উচিত। লেনদেন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ইকবালকে যে টাকা দেওয়া হয়েছে বলে বলা হচ্ছে, সে তো তাদেরই লোক।

এর আগে দেশে প্রথমবারের মতো ল্যাপটপ সংযোজনের জন্য মালয়েশিয়ার টিএফটি ও বাংলাদেশের ২এম করপোরেশন রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি টেলিফোন শিল্প সংস্থার (টিএসএস) সঙ্গে ২০১০ সালের মে মাসে ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করে। ২০১১ সালের জানুয়ারিতে এ বিষয়ে চুক্তি করে তিন পক্ষ। চুক্তিতে অবকাঠামোর জন্য টেশিস পায় ৩০ শতাংশের মালিকানা। বাকি বিনিয়োগের জন্য ৭০ শতাংশ পায় অপর দুই কোম্পানি। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরোলেও কোনো বিনিয়োগ করছিল না টিএফটি ও ২এম করপোরেশন। ওয়াং জানান, এটিই ছিল তাদের কৌশল। একপর্যায়ে অগ্রাধিকার প্রকল্প হওয়ায় সরকারের অপর কোম্পানি বিটিসিএল থেকে ২৫ কোটি টাকা ধার নেয়। এই টাকা নিয়েই ভাগবাটোয়ারা শুরু হয়ে যায় ২০১১ সালের মাঝামাঝি সময়ে।

এর আগে স্বল্প মূল্যের যন্ত্রপাতি বেশি দামে এবং সংশ্লিষ্ট নয়, এমন যন্ত্রপাতি গছানো হচ্ছে ধরতে পেরে টিএফটির দাবি করা বেশ কিছু টাকা আটকে দেয় টেশিস। তাদের ১০ লাখ ছয় হাজার ডলারের বিপরীতে ততক্ষণে দেওয়া হয়েছে ছয় লাখ ২০ হাজার ডলার। টিএফটির তখন আরও তিন লাখ ৮৫ হাজার ডলার পাওনা। টিএফটি জানায়, তারা যে ছয় লাখ ২০ হাজার ডলার পেয়েছে, তার মধ্যে পৌনে চার লাখ ডলার ঘুষ দিতে গিয়ে তাদের লোকসানে পড়তে হয়েছে। বাকি টাকা পেতে তারা দফায় দফায় টেশিসে ধরনা দেয়। একপর্যায়ে বাকি থাকা তিন লাখ ৮৫ হাজার ডলার থেকে মাত্র ৪০ হাজার ডলার পেলেই দাবি ছেড়ে দেওয়া এবং পরে এই টাকা পেতেই মরিয়া হয়ে ওঠে তারা। বিষয়টির রফা করতে ঢাকা থেকে কয়েক দফা মালয়েশিয়ায় টেশিসের কর্মকর্তারাও যাতায়াত করেন।

গত জুলাই মাসে এই প্রতিবেদক মালয়েশিয়ায় গেলে মাইকেল ওয়াংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সেখানেও কয়েক দফা তার সঙ্গে আলাপ হয়। এ সময় তিনি বলেন, যে পৌনে চার লাখ ডলার তিনি দিয়েছেন, তার বড় অংশ মন্ত্রীর (রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু) পকেটেই গেছে। এ সময় তিনি অতিরিক্ত সচিব রফিকুল ইসলামের সঙ্গে মন্ত্রীর সখ্যের বিষয়টি তুলে ধরেন। লোপাটের পুরো আয়োজন তিনিই সম্পন্ন করেছেন বলে জানান ওয়াং। একই কারণে

টেশিস এবং টিএফটি মিলে আলাদা যে কোম্পানি গঠিত হয়, সেখানে মন্ত্রীর কোনো অবস্থান না থাকলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈঠকে মন্ত্রীর থাকার বিষয়গুলো নিশ্চিত করেন রফিকুল ইসলাম।

এ প্রসঙ্গে রফিকুল ইসলাম বলেন, বললেই তো হবে না যে মন্ত্রী ভাগ পেয়েছেন। মন্ত্রীর সঙ্গে তো ওয়াংয়ের কখনও দেখাও হয়নি; বরং তখনকার এমডি (মোহাম্মদ ইসমাইল) ভাগ পেতে পারেন। তাদের মধ্যে লেনদেন নিয়ে ঝগড়া শুরু হলেই বিষয়টি অন্যদের নজরে আসে।

টেশিসের একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, টিএফটি-২এম মিলে ১০ লাখ ছয় হাজারের কিছু বেশি ডলারের যন্ত্রপাতি মালয়েশিয়া থেকে আনে বলে হিসাবে দেখানো হয়। পরে একপর্যায়ে টিএফটির সিইও ই-মেইলে টেশিসের কয়েকজনকে জানান, কাগজে-কলমে অন্তত ৩০০ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি করে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি করা হয়। টেশিসের এক কর্মকর্তা জানান, কাজ করতে গিয়ে তারা দেখেন, যেসব যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়েছে, ল্যাপটপ উৎপাদনে তা কোনো কাজেই লাগছে না। তখন এসব যন্ত্রপাতির ওপর গুণগত মান যাচাই করার জন্য বুয়েটের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে জরিপ করানো হয়। সেখানে দেখা যায়, ল্যাপটপ প্রকল্পের নামে মূলত এলসিডি টেলিভিশনের যন্ত্রাংশ পাঠানো হয়েছে। তা ছাড়া যন্ত্রপাতির মধ্যে টেবিল-চেয়ারও ধরা হয়েছে। সেসব যন্ত্রপাতির অধিকাংশই এখন টেশিসে স্ক্রাপ হিসেবে পড়ে আছে।

চতুরতার এই তথ্য বেরিয়ে আসার পরেই বাকি পাওনা আটকে দেয় টেশিসের তখনকার এমডি। সূত্রগুলো জানিয়েছে, বিষয়গুলো নিয়ে নাড়াচাড়া বাড়তে থাকলে একপর্যায়ে গত বছরের ২৯ আগস্ট মালয়েশিয়ান কোম্পানিকে ল্যাপটপ প্রকল্প থেকে বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু কী প্রক্রিয়ায় তাদের বের করা হবে, সেটি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এ বিষয়ে রফিকুল ইসলাম বলেন, আগামী এক মাসের মধ্যেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। ১৪ মাসেও কেন সব ঠিক হয়নি—এ প্রশ্নের উত্তর দেননি তিনি।

লেনদেনের অভিযোগের বিষয়ে সাবেক টেলিযোগাযোগমন্ত্রী রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু বলেন, মোহাম্মদ ইকবালকে তিনি চেনেন না। এ বিষয়ে তিনি কিছু জানেনও না; বরং তিনি মোহাম্মদ ইসমাইলকে পুরো বিষয়ের জন্য দায়ী করেন। তিনি বলেন, 'ইসমাইল কিছু করে গিয়ে থাকতে পারে। এসব অপপ্রচার সে-ই ছড়াচ্ছে।'

মালয়েশিয়ান কোম্পানিকে ল্যাপটপ উৎপাদনের প্রক্রিয়া থেকে বের করে দেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ২এম এবং টিএফটি টাকা দেয় না। সে কারণে তাদের বের করে দেওয়া হয়েছে। টাকা দেবে না আর তাদের কেন অহেতুক কোম্পানি বয়ে বেড়াবে?

মন্ত্রীর এ বক্তব্যের উত্তরে ওয়াং বলেন, শুরুতে থাকলেও পরে হিসাব বুঝে নেওয়ার পর ইকবাল মোহাম্মদ ২এম কোম্পানি থেকে সরে পড়েছেন। এখন তার ছেলেমেয়েরা কোম্পানি চালায়।

দুদকে তদন্তের সিদ্ধান্ত বাতিল : পুরো ঘটনা কয়েক দফা ই-মেইলে মাইকেল ওয়াং টেশিসের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জানিয়েছেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯ ডিসেম্বর বৈঠকে বিষয়গুলো তদন্তের জন্য দুদকেও পাঠানোর প্রস্তাব গ্রহণ করে টেশিস বোর্ড। পরের বৈঠকে কার্যবিবরণী অনুমোদন করার সময় দুদকের তদন্তের সিদ্ধান্ত বাতিল হয়; বরং নতুন এমডি সেখানে

কয়েকটি লাইন লাল কালি দিয়ে কেটে দিয়ে দুদকে তদন্তের আগে নিজেরা তদন্ত করার কথা লেখেন। অবশ্য সেই তদন্ত কমিটি এখনও গঠিত হয়নি এবং কোনো তদন্তও হয়নি।

টিএফটিকে উকিল নোটিশ : কার্যত বাদ দেওয়া হলেও যেহেতু সরকারের নিবন্ধিত কোম্পানি ছিল টিএসএস-টিএফটি ২এম করপোরেশন, সে কারণেই চাইলেই টিএফটিকে বাদ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম সম্পন্ন করতে সমঝোতাপূর্ণ (অ্যামিক্যাবল) সেটেলমেন্টে যেতে চাইছে টেশিস। রফিকুল ইসলামও বলছেন, এক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো সম্ভব হবে।

মন্তব্য

প্রতিবেদনটি সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম বা দুর্নীতির চিত্র বেশ ভালোভাবে তুলে আনতে পেরেছে। পড়লেই বোঝা যায়, প্রতিবেদকের হাতে দুর্নীতির প্রচুর সাক্ষ্য-প্রমাণ ছিল। তিনি অনেকের সঙ্গে কথা বলেছেন। অনেক দলিল সংগ্রহ করেছেন। তার অনুসন্ধানে নতুন অজানা অনেক তথ্যই বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু একই সঙ্গে অনেক প্রশ্নের উত্তর না থাকা, কিছু তথ্যগত বিভ্রান্তি, অনুচ্ছেদগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতার অভাব এবং লম্বা দৈর্ঘ্য প্রতিবেদনটিকে দুর্বল করেছে।

প্রতিবেদনটি সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম বা দুর্নীতির চিত্র বেশ ভালোভাবে তুলে আনতে পেরেছে। পড়লেই বোঝা যায়, প্রতিবেদকের হাতে দুর্নীতির প্রচুর সাক্ষ্য-প্রমাণ ছিল। তিনি অনেকের সঙ্গে কথা বলেছেন। অনেক দলিল সংগ্রহ করেছেন। তার অনুসন্ধানে নতুন অজানা অনেক তথ্যই বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু একই সঙ্গে অনেক প্রশ্নের উত্তর না থাকা, কিছু তথ্যগত বিভ্রান্তি, অনুচ্ছেদগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতার অভাব এবং লম্বা দৈর্ঘ্য প্রতিবেদনটিকে দুর্বল করেছে।

শুধু সরকারি অর্থ-ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকেই যদি বিচার করা হয়, তাহলে প্রথম অনুচ্ছেদেই কিছু সমস্যা চোখে পড়বে। এখানে বলা হচ্ছে, 'হাজার ডলারের যন্ত্রপাতির মূল্য লাখ ডলার দেখিয়ে আমদানি করা হয়েছে। সে কারণে দেড় লাখ ডলারের পণ্যের মূল্য দেখানো হয় ১০ লাখ ৬ হাজার ৫৪০ ডলার। ৩০০ শতাংশ বেশি মূল্য দেখিয়ে আমদানি করা অর্থের ভাগবাটোয়ারা হয়েছে মালয়েশিয়ার পেনাং এবং নিউইয়র্কে।'

প্রথমত, লাখ ডলার দেখিয়ে আমদানি করা পণ্য যে হাজার ডলারের তার সাপেক্ষে কোনো বিস্তারিত তথ্য বা প্রমাণের উদাহরণ প্রতিবেদনে নেই। হয়তো প্রতিবেদকের কাছে সব তথ্যই ছিল। কিন্তু ব্যবহার না করায়, প্রতিবেদনটি দুর্বল হয়েছে। দরপত্র থেকে পণ্যের স্পেসিফিকেশন জেনে, তার সঙ্গে সরবরাহ করা পণ্যের স্পেসিফিকেশন ও বাজারদর মিলিয়ে নিলেই ফারাক বেরিয়ে আসত। এখানে ধরে নেয়া হচ্ছে, দেড় লাখ ডলারের পণ্যের মূল্য দেখানো হয় ১০ লাখ ৬ হাজার ৫৪০ ডলার। কিন্তু ঐ পণ্যের আসল দাম যে দেড় লাখ ডলার

তার প্রমাণ কী? এই হিসাব ধরলে প্রায় সাত গুণ বেশি দামে পণ্য কেনা হয়েছে। অথচ পরের লাইনেই বলা হচ্ছে, '৩০০ শতাংশ বেশি মূল্য দেখিয়ে আমদানি করা'। তাহলে পাঠক কোন তথ্যটিকে বিশ্বাস করবে? ৩০০ শতাংশ নাকি সাত গুণ।

সরকারি তহবিল নিয়ে প্রতিবেদন লেখার সময় এ জাতীয় সংখ্যার ব্যবহার নিয়ে সতর্ক থাকতে হয়। কারণ সামান্য অসতর্কতা প্রতিবেদনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন জন্ম দিতে পারে। প্রতিবেদনে সরবরাহ করা পণ্য নিয়ে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটের একটি জরিপের কথা বলা হয়েছে। সেখান থেকে কয়েকটি উদাহরণ দিলে দুর্নীতির ধরন আরো স্পষ্ট হতো।

প্রতিবেদনের অন্যতম চরিত্র মোহাম্মদ ইকবাল, যাঁর নামে ২ লাখ ৯৯ হাজার ডলার জমা করে টিএফটি। পৌনে ৪ লাখ ডলার ঘুষ লেনদেনের কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ঘুষদাতা ও গ্রহীতা, কার কী সম্পর্ক তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রতিবেদনের শেষ দিকে এসে বলা হচ্ছে, তিনি একসময় ল্যাপটপ তৈরির কাজ পাওয়া দেশি প্রতিষ্ঠান ২এম এ কর্মরত ছিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁকে পরিচয় করানো হচ্ছে ইকবাল মোহাম্মদ নামে। পদ-পদবিও বলা হয়নি।

কোনো বিনিয়োগ না করে টিএফটি ও ২এম করপোরেশন কীভাবে বিটিসিএল থেকে ২৫ কোটি টাকা ধার নিল। এই টাকা কীভাবে ভাগবাটোয়ারা হলো, সেই তথ্যও প্রতিবেদনে অনুপস্থিত। এসব ছাড়াও প্রতিবেদনটিতে অনুচ্ছেদগুলো বেশ দীর্ঘ। একটি অনুচ্ছেদের সঙ্গে আরেক অনুচ্ছেদের ধারাবাহিকতায় সমস্যা প্রতিবেদনের পাঠযোগ্যতায় প্রভাব ফেলেছে।

নবম অধ্যায়

সংখ্যার ব্যবহার

বাজেট বা আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতে গেলে সেখানে স্বাভাবিকভাবেই অনেক সংখ্যা আসবে। একটি ভালো মানের প্রতিবেদন লেখার সময় এই সংখ্যার সঠিক ব্যবহার জানা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সংখ্যা যেমন একদিকে প্রতিবেদনের বস্তুনিষ্ঠতা বা তথ্যের গভীরতা প্রমাণে সাহায্য করে। আবার এই সংখ্যাই পাঠক বা দর্শককে বিরক্ত করে এবং প্রতিবেদন থেকে তাদের মনোযোগ সরিয়ে দেয়।

সবার আগে মনে রাখতে হবে, পত্রিকা হোক বা টেলিভিশন, মানুষ প্রতিবেদনে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে চায়, সংখ্যা নয়। পাঠক বা দর্শক জানতে চায় ঐ সংবাদের সঙ্গে তার জীবনের সম্পর্ক কী। তাই লেখনীর ক্ষেত্রে সংখ্যা যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভালো। যদি সংখ্যার আধিক্য কোনোভাবেই কমানো না যায়, তাহলে প্রতিবেদনটিই ছোট করে ফেলা উচিত, যাতে পাঠকের মনঃসংযোগে সমস্যা না হয়।

কোনো কোনো সময় দেখা যায়, একটি বিষয়ে বছর, অঞ্চল বা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে তুলনামূলক অনেক সংখ্যা থাকে। এসব ক্ষেত্রে সব সংখ্যাকে একটি চার্টের মাধ্যমে মূল প্রতিবেদন থেকে আলাদা করে দেয়াই ভালো। অন্যদিকে লেখার ধারাবাহিকতা বা প্রাঞ্জলতাও অনেক সংখ্যার কারণে নষ্ট হবে না।

প্রতিবেদনে যে শুধু সংখ্যা কম থাকতে হবে তা নয়। যেগুলো আছে, সেগুলোকেও সহজভাবে ব্যবহার করা জরুরি। সংবাদে সহজ সংখ্যা ব্যবহারের কয়েকটি কৌশল আছে। তার কয়েকটি এই অধ্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো। সাধারণ নিয়মের ক্ষেত্রে রয়টার্সের সংখ্যা ব্যবহার নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে। দেশে যেসব গণমাধ্যমে লেখার নিজস্ব রীতি বা স্টাইল গাইড আছে, তারা সাধারণ নিয়মের জন্য সেটাই অনুসরণ করতে পারেন।

সংখ্যা ব্যবহারের সাধারণ নিয়ম

লেখায় সংখ্যা ব্যবহারের কিছু সাধারণ নিয়ম আছে। যেমন : এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা লিখতে হবে বানান করে। কোনো ভাবেই ১, ২, ৩ বা ৯ নয়। লিখতে হবে এক, দুই, তিন বা নয় এভাবে। সংখ্যার মান ১০ বা তার বেশি হলে, তখন তা অঙ্কে প্রকাশ করতে হবে। যেমন : ১১, ৮৯, ৯৯ ইত্যাদি। একই নিয়ম ক্রমনির্দেশক সংখ্যার বেলায়ও। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় থেকে শুরু করে নবম পর্যন্ত লিখতে হবে কথায়। আর ১০ম, ১১তম থেকে শুরু করে ১০১তম বা ১৪৪তম—এধরনের ক্রমের ক্ষেত্রে অঙ্কে। বাংলা ভাষায় দশম শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। তবে তারপরের ক্রমগুলোতে অঙ্ক ব্যবহার করাই ভালো।

অবশ্য এই নিয়মেরও বেশ কিছু ব্যতিক্রম আছে। যেমন : সময় ও তারিখ। এ ক্ষেত্রে মাস বা ক্ষণের আগে অঙ্ক বসাতে হবে। যেমন : ৯ জানুয়ারি, বিকেল ৫টা। একইভাবে বয়সের ক্ষেত্রে লিখতে হবে ৪ বছর, ৫ বছর, ১০ বছর। কখনোই চার বছর বা পাঁচ বছর—এমন নয়।

এর নিচের সংখ্যা বানানের পরিবর্তে অঙ্কে লেখার আরো কিছু ক্ষেত্র আছে। যেমন : শতকরা হার। % চিহ্ন অথবা শতাংশ—যেভাবেই লেখা হোক না কেন শতকরা হারের আগে অঙ্ক বসবে। যেমন : চলতি বছর বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির প্রবৃদ্ধি হবে ৬ শতাংশ অথবা ৬%। কিন্তু ছয় শতাংশ বা ছয়% নয়। একইভাবে মিলিয়ন, বিলিয়ন, লাখ বা কোটির মতো পরিমাণ নির্দেশক শব্দের আগেও অঙ্ক ব্যবহার করা উচিত। যেমন : ৩ লাখ, ৬ কোটি ইত্যাদি। আবার কোনো সংখ্যা একক নির্দেশক শব্দের আগে বসলেও অঙ্ক ব্যবহার করা যায়। যেমন : ৩ সেমি, ৪ কিমি ইত্যাদি।

পারতপক্ষে সংখ্যা দিয়ে কোনো বাক্য শুরু করা উচিত নয়। যদি একান্তই শুরু করতে হয়, তাহলে এমন ক্ষেত্রে ১০-এর চেয়ে বড় সংখ্যাও অঙ্কে লিখতে হবে। যেমন, পনেরো টাকার সাবান কেনা হয়েছে ২৫ টাকায়। আর সংখ্যা জটিল হলে, তা দিয়ে বাক্য শুরু করা যাবে না (যেমন : দুইশ তেতাল্লিশ কোটি টাকা খরচ করে সেতু বানানো হচ্ছে গড়াই নদীর ওপরে)। এ ক্ষেত্রে বাক্যটিকে এমনভাবে লিখতে হবে যেন সংখ্যা মাঝখানে থাকে।

পূর্ণমাণ সংখ্যায় প্রকাশ

একটি বড় সংখ্যাকে তার সবচেয়ে কাছাকাছি পূর্ণমান সংখ্যায় প্রকাশ করলে লেখা সহজবোধ্য হয়। এই পূর্ণমানের প্রকাশের কিছু নিয়ম আছে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। সম্প্রতি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স নিয়ে একটি বিশেষ অডিট হয়েছে। সেই অডিটে বেশ কিছু অনিয়ম পাওয়া গেছে। তার একটির শিরোনাম এরকম :

'চলতি বছর বিমানের করাচী ষ্টেশনে সেলস এজেন্টগণের নিকট হতে রাজস্ব বাবদ সংগৃহীত অর্থ বিমানের ব্যাংক হিসাবে জমা না করে আত্মসাৎ করায় ক্ষতি ৫,০৩,৪৮,২৮০ পাকিস্তান রুপি সমপরিমাণ বাংলাদেশী টাকা ৬,২৯,৩৫,৩৫০। গত বছর একইভাবে ৩ কোটি ১৫ লাখ টাকা আত্মসাৎ হয়।'

প্রতিবেদনের জন্য মোট ক্ষতির পরিমাণ হিসেবে যে সংখ্যাটি দেয়া হয়েছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিষয় হচ্ছে, ৬,২৯,৩৫,৩৫০ সংখ্যাটিকে আমরা কীভাবে ব্যবহার করব। এ

ক্ষেত্রে সহজ সংখ্যা হলো **৬ কোটি ২৯ লাখ** টাকা। বড় সংখ্যাটিকে কোটি বা লাখের মতো শব্দ দিয়ে ভেঙে ফেলতে হবে। একই সঙ্গে বড় অঙ্কটিকে পূর্ণমান সংখ্যায় বদলে ছোট করে আনতে হবে, যাতে পাঠক সহজে সেই সংখ্যার অর্থ ধরতে পারেন।

এভাবে সহজ সংখ্যায় পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে কাছের এককটিকে বেছে নিতে হবে। যেমন : কোটির চেয়ে বড় কোনো সংখ্যার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কাছের একক হলো লাখ। **৬,২৯,৩৫,৩৫০** এই সংখ্যার জন্য ৬ কোটির পর ২৯ লাখ দিয়ে একে পূর্ণমানে প্রকাশ করা হয়েছে। একইভাবে সংখ্যাটি হাজারের ঘরে হলে তার সবচেয়ে কাছের পূর্ণমান একক হবে শতক, শতকের ক্ষেত্রে দশক, বিলিয়নের ক্ষেত্রে মিলিয়ন, মিলিয়ন বা লাখের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কাছের ১০ হাজার।

ধরা যাক প্রতিবেদন লেখার সময় আপনি একটি চার্ট থেকে তথ্য ব্যবহার করছেন। সেখানে দেখা গেল, দশমিকের পর তিন থেকে চার সংখ্যা পর্যন্ত দেয়া আছে। লেখার সময় তাকেও দশমিকের পর দুই বা এক সংখ্যার পূর্ণমানে প্রকাশ করতে হবে। যেমন : ১৫.৫৬৫। এ ক্ষেত্রে পূর্ণমান ১৫.৫৭। সংখ্যাটি যদি হয় ১৫.৫৬৪, তাহলে পূর্ণমান হবে ১৫.৫৬। তবে সুদের হার, মুদ্রার বিনিময় হার এবং কোম্পানি লভ্যাংশের বেলায় সংখ্যাকে সংক্ষিপ্ত করে পূর্ণমানে প্রকাশ করা ঝুঁকিপূর্ণ।

সংখ্যার বিভ্রাট

লেখার সময় সংখ্যা দিয়ে বিস্তৃতি বা ব্যাপ্তি বোঝাতে গেলে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। যেমন : প্রতিমাসে জাতীয় পতাকাবাহী এয়ারলাইনস বিমানে ২২ কোটি থেকে ২৩ কোটি টাকার তেল লাগে। এখানে কোটি শব্দটি দুই বার ব্যবহার হলেও, এভাবেই লিখতে হবে। কারণ, ২২ থেকে ২৩ কোটি লিখলে পাঠকের বিভ্রান্ত হবার সুযোগ আছে।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। অনেক সময় এ ধরনের বিস্তারকে ২২-২৩ কোটি এভাবে লেখার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু এমন ক্ষেত্রে দুটি সংখ্যার মাঝখানে (-) চিহ্নের বদলে 'থেকে' শব্দটি ব্যবহার করতে হবে। তা না হলে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। (যেমন : ৪০০ থেকে ৫০০ মাইল। কখনোই ৪০০-৫০০ মাইল নয়।)

কখনোই দুটি সংখ্যা পাশাপাশি লেখা যাবে না। যেমন, রাষ্ট্রীয় মালিকানার প্রতিষ্ঠান এবিসি কোম্পানি বাজারে ২০০০০০০ ১০ টাকার শেয়ার ছেড়েছে। এখানে দুটো সংখ্যাই একসঙ্গে লেখায় বড় ধরনের বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে দুটো সংখ্যাকে মাঝখানে কোনো শব্দ বসিয়ে আলাদা করে দিতে হবে। যেমন : রাষ্ট্রীয় মালিকানার প্রতিষ্ঠান এবিসি কোম্পানি ১০ টাকা দামের ২০ লাখ শেয়ার বাজারে ছেড়েছে।

সংখ্যার মাত্রা

একটি নির্দিষ্ট বছরে বিমানের **৬,২৯,৩৫,৩৫০ টাকা** লোকসানের অঙ্কটিকে এমনভাবেও লেখা যায় : **সোয়া ছয় কোটির বেশি**। এভাবে যেখানে প্রযোজ্য, আগে সাড়ে, পৌনে বা সোয়ার মতো শব্দ ব্যবহার করেও বড় সংখ্যাকে সহজবোধ্য করা যায়। যেখানে দরকার বড়

সংখ্যার পরিবর্তে দ্বিগুণ, তিন গুণ, চার গুণের মতো শব্দও পাঠকের বোঝার জন্য আরো সহজ হতে পারে। যেমন : উদাহরণ অনুযায়ী, বিমানের করাচি স্টেশনে গত বছরের সঙ্গে চলতি বছরের আত্মসাৎ হওয়া টাকার পরিমাণ তুলনা করলে দেখা যাবে, **এক বছরে করাচিতে বিমানের টাকা আত্মসাৎ বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।**

তবে ইংরেজিতে কোটি, লাখ, মিলিয়ন বা বিলিয়ন জাতীয় শব্দের আগে এমন মাত্রা ব্যবহার বিরক্তিকর হতে পারে। কারণ সেখানে বাংলার মতো আড়াই, সাড়ে, পৌনে বা সোয়ার মতো এক শব্দে প্রকাশ করার উপায় নেই। তাই 'two and a half million'-এর পরিবর্তে লিখতে হবে 2.5 million.

সংখ্যার গড়

ধরা যাক, করাচীতে বিমান চলতি বছর ৬ কোটি ২৯ লাখ টাকা লোকসান দিয়েছে। এই অঙ্ক ২০১৩ সালে ছিল ৩ কোটি ১৫ লাখ। ২০১২ সালে ৪ কোটি ২৭ লাখ। ২০১১ সালে ৪ কোটি ৬৬ লাখ। ২০১০ সালে ৩ কোটি ২৬ লাখ।

এই পাঁচটি তথ্য প্রতিবেদনে বসিয়ে দিলে সেই লেখা পাঠকের জন্য বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়াবে। আবার খুব সহজেই এখান থেকে কোনো প্যাটার্ন বা ধরনও বের করা যায় না। এ অবস্থায় এতগুলো সংখ্যাকে সহজে প্রকাশ করার ভালো উপায় হলো গড়। গত পাঁচ বছরের এই হিসাব থেকে বলা যায়, করাচির বিমান অফিস প্রতিবছর গড়ে ৪ কোটি ৩৩ লাখ টাকা করে লোকসান দিচ্ছে। এই একটি সংখ্যা দিয়েই এখন লোকসানের প্রবণতা বোঝা যাচ্ছে।

গড় বের করার উপায় হলো, যতগুলো উপাত্ত আছে তা দিয়ে সব উপাত্তের মানের যোগফলকে ভাগ করা। উপরের উদাহরণে সংখ্যা বা উপাত্ত আছে ৫টি। এখান থেকে গড় বের করা নিয়ম নিচে দেয়া হলো।

$$\frac{\text{৬.২৯ কোটি} + \text{৩.১৫ কোটি} + \text{৪.২৭ কোটি} + \text{৪. ৬৬ কোটি} + \text{৩.২৬ কোটি}}{\text{৫}}$$

গড় = ৪.৩২৬ কোটি

গড় ব্যবহারের কিছু ঝুঁকি আছে। যদি এই প্রশ্ন করা হয়, একজন মানুষের গড়ে কয়টা পা আছে? এর উত্তর দুই নয়। দুইয়ের কিছুটা নিচে। কারণ, গড় ফলাফল, সামান্য ব্যতিক্রম দিয়েও প্রভাবিত হয়। বিশ্বে একটি পা আছে অথবা একটাও পা নেই এমন মানুষের সংখ্যা, দুই পা-ধারীদের তুলনায় নগণ্য। তবু গড় করলে, ফলাফল দুইয়ের নিচেই থাকবে।

গড় ফলাফলে ছোট ছোট অনেক ব্যতিক্রম বা সত্তাই হারিয়ে যায়। যেমন : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশ। এর মানে গোটা দেশের জন্যই প্রবৃদ্ধির গড় সংখ্যা এটাই। অথচ এর মধ্যেই কোনো কোনো খাতের খুব ভালো করার তথ্য যেমন আছে, তেমনি কোনো খাতের ডুবে যাবার তথ্যও আছে। এই প্রবৃদ্ধি দেখে বোঝার

উপায় নেই সংখ্যাগরিষ্ঠ খাতই ভালো করছে কি না। হয়তো একটি খাত এতই ভালো করেছে যে, তা ১০টি দুর্বল খাতের দুর্দশাকে ঢেকে দিয়েছে। তাই গড় যে সব সময়ই সংখ্যাগরিষ্ঠের কথা বলবে, অথবা মাঝামাঝি একটা অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করবে তা নয়।

অনেক সংখ্যা থেকে মাঝামাঝি একটি প্রবণতা বের করার উপায় হলো মধ্যক। সব সংখ্যাকে মানের ক্রম অনুযায়ী (বড় থেকে ছোট অথবা ছোট থেকে বড়) সাজালে, সেখান থেকে মাঝামাঝি মানের সংখ্যাটি নিয়ে এ ধরনের প্রবণতা বা ধরন বের করা যায়।

ধরন বের করার আরেক উপায় হলো প্রচুরক। অনেক সংখ্যার মধ্যে যে মান সবচেয়ে বেশি, সেটিই প্রচুরক। এটি সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই প্রতিবেদন তৈরির সময় সংখ্যা এবং বিশ্লেষণের ধরন বুঝে পছন্দসই পদ্ধতি বেছে নিতে পারেন।

অনুচ্ছেদ ০৫

শিরোনাম : বিমানের করাচি স্টেশনে সেলস এজেন্টদের নিকট হতে রাজস্ব বাবদ সংগৃহীত অর্থ বিমানের ব্যাংক হিসাবে জমা না করে আত্মসাৎ করায় ক্ষতি ৫,০৩,৪৮,২৮০ পাকিস্তান রুপির সমপরিমাণ বাংলাদেশি টাকা ৬,২৯,৩৫,৩৫০।

বিবরণ : বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লি.-এর ১৯৯৬-৯৭ হতে ২০০৫-২০০৬ সাল পর্যন্ত সময়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে নথি নং-ঢাকজিএক্স /১৫/৩০৫১/২০০৭ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ডিসেম্বর / ৯৮ হতে জুন/০৫ পর্যন্ত সময়কালে বিমান করাচি স্টেশনে ৬ জন সেলস এজেন্টের নিকট হতে বিমানের রাজস্ব বাবদ গৃহীত অর্থ বিমানের ব্যাংক হিসাবে জমা না করে মোট ৫,০৩,৪৮,২৮০ পাকিস্তানি রুপি সমপরিমাণ বাংলাদেশি ৬,২৯,৩৫,৩৫০ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট 'খ' তে দেখানো হলো) এজেন্টভিত্তিক আত্মসাৎকৃত অর্থের পরিমাণ নিম্নরূপ :

ক্রমিক নম্বর	এজেন্টের নাম	পাকিস্তানি রুপি	বাংলাদেশি টাকা
১	মেসার্স ট্রাভেল সার্ভিসেস (টিএসআই)	৪,২৮,১৯,৪৪৯.০০	৫,৩৫,২৪,৩১১.০০
২	মেসার্স আলী হামিদ	৫৭,০০,২৮১.০০	৭১,২৫,৩৫১.০০
৩	মেসার্স ইন্টার গ্লোব ট্রাভেলস	১৪,৫৮,২৪৭.০০	১৮,২২,৮০৯.০০
৪	মেসার্স বিএনএস কার্গো	২,৫০,৪৯১.০০	৩,১৩,১১৪.০০
৫	মেসার্স উসমান ট্রাভেলস	১,০০,০০০.০০	১,২৫,০০০.০০
৬	মেসার্স ইউনাইটেড ফ্রেইট সিস্টেম	১৯,৮১২.০০	২৪,৭৬৫.০০
	মোট	৫,০৩,৪৮,২৮০.০০	৬,২৯,৩৫,৩৫০.০০

- উল্লেখ্য, বিমান স্টেশন করাচি কর্তৃক বিভিন্ন সেলস এজেন্টের নিকট হতে পাক্ষিক ভিত্তিতে ক্যাশ রিসিপ্ট (সিআর) ইস্যুপূর্বক বিমানের রাজস্ব আদায় করা হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে তা বিমানের ব্যাংক হিসাবে জমা করতে হয়।

- সেলস এজেন্ট হতে সি আর এর মাধ্যমে বিমানের রাজস্ব বাবদ গৃহীত অর্থ ব্যাংক হিসাবে জমা না করে ভুয়া জমা বিবরণী প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ পূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কর্তৃক উক্ত অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে।
- বিমান করাচি স্টেশনে ডিসেম্বর/৯৮ হতে জুন/০৪ সময়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সেলস এজেন্ট এবং ব্যাংকের সাথে যোগসাজশ করে ৬,২৯,৩৫,৩৫০ টাকা আত্মসাৎ পূর্বক বিমানের ক্ষতি করা হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব

- বিষয়টি করাচির সিন্ধু হাইকোর্টে বিচারাধীন রয়েছে। আদালতের রায়ের পর অর্থ আদায়ের অগ্রগতি জানানো হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- বিমানের অর্থ আত্মসাৎকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা বিমান কর্তৃপক্ষের গাফিলতির পরিচয় বহন করে।
- এ বিষয়ে ০৯-০৬-০৮ খ্রি. তারিখে অগ্রিম হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৯-০৭-০৮ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। মন্ত্রণালয়ের ৩১-০৭-০৮ খ্রি. তারিখের জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি। কারণ আদালতে বিচারাধীন থাকলেও এ ধরনের অনিয়মের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের যোগসাজশের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। মামলার সর্বশেষ অবস্থা এবং জড়িতদের বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম জানাতে ২৩-১০-০৮ খ্রি. তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৭-১২-০৮ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিট প্রতিবেদনের উদাহরণ

সংখ্যার সহজ বিশ্লেষণ

ওপরের ছবিতে একটি উদাহরণ আছে। সেখানে কোন এজেন্ট বিমানের কত টাকা আত্মসাৎ করেছে তার একটি তালিকা দেয়া আছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, মেসার্স ট্রাভেল সার্ভিসেস (টিএসআই) আত্মসাৎ করেছে ৫,৩৫,২৪,৩১১ টাকা, মেসার্স আলী হামিদ করেছে ৭১,২৫,৩৫১ টাকা মেসার্স ইন্টার গ্লোব ট্রাভেলস নিয়েছে ১৮,২২,৮০৯ টাকা, মেসার্স বিএনএস কার্গো ৩,১৩,১১৪ টাকা, মেসার্স উসমান ট্রাভেলস ১,২৫,০০০ টাকা এবং মেসার্স ইউনাইটেড ফ্রেইট সিস্টেম ২৪,৭৬৫।

ওপরের মতো করে তথ্যগুলো প্রতিবেদনে দেয়া হলে পাঠক মনোযোগ হারাবে, এটা নিশ্চিত। এ ক্ষেত্রে সবগুলো তথ্যকে সহজে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে এভাবে : বিমানের টাকা আত্মসাতের সঙ্গে জড়িত করাচির ছয়টি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিয়েছে মেসার্স ট্রাভেল সার্ভিসেস (টিএসআই)।

শতকরা হার বা অনুপাতের ব্যবহার

উপরের উদাহরণ থেকে যে-কারো মনে প্রশ্ন জাগবে যে সবচেয়ে বেশি টাকা আত্মসাৎ করেছে, সে আসলে কত টাকা নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে আবারও টাকার অঙ্ক ব্যবহার করলে আত্মসাতের মোট অঙ্কের তুলনায় সবচেয়ে বড় আত্মসাতের ঘটনাটি কত বড় তা বোঝানো মুশকিল হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সমাধান হলো : শতাংশ বা শতকরা হার ব্যবহার। যেমন : মেসার্স ট্রাভেল সার্ভিসেস (টিএসআই) একাই মোট টাকার শতকরা ৮৫ ভাগ আত্মসাৎ করেছে।

শতকরা হার কীভাবে বের করবেন :

$$\frac{\text{যে সংখ্যা তুলনা করা হবে} \times ১০০}{\text{যার সঙ্গে তুলনা করা হবে}} = \text{শতকরা হার}$$

$$\frac{\text{(টিএসআই) ৫,৩৫,২৪,৩১১} \times ১০০}{\text{(মোট) ৬,২৯,৩৫,৩৫০}} = ৮৫\%$$

তুলনামূলক হ্রাস-বৃদ্ধি বোঝানোর জন্য শতকরা হার খুব ভালো একটি উপায়। সরকারি তহবিল নিয়ে প্রতিবেদন তৈরির সময় প্রায়ই আগের সময়ের সঙ্গে তুলনা করে বাজেট বা ব্যয়ের পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধিও বিশ্লেষণ করতে হয়। যেমন : কোনো একটি নির্দিষ্ট খাতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৭৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দ ৬০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ, এক বছরে বরাদ্দ কমেছে ১৫০ কোটি টাকা। কিন্তু বরাদ্দ কী হারে কমল?

$$\frac{(৬০০-৭৫০) \times ১০০}{৬০০} = -২৫$$

অর্থাৎ, ২৫% কমে গেল।

প্রতিবেদনে শতকরা হার ব্যবহারের সময় সতর্ক থাকতে হবে কিছু বিষয়ে। সব সময় মাথায় রাখতে হবে যে শতকরা হার ব্যবহার করা হচ্ছে, তা মূলত কীসের সাপেক্ষে। যদি বলা হয়, কোন রাস্তা তৈরির খরচ ১০ শতাংশ বেড়েছে, তাহলে অবশ্যই সঙ্গে জানিয়ে দিতে হবে, এই বৃদ্ধি কি আগের বছরের তুলনায়, নাকি একই ধরনের আরেকটি রাস্তার তুলনায়। এই তুলনা না থাকলে শতাংশের ব্যবহার অর্থহীন হয়ে যায়।

দেখা গেল আগে একটি প্রতিষ্ঠানে ১০ টাকা ঘুষ দিতে হতো। এখন ২০ টাকা দিতে হয়। তাহলে কি বলা উচিত হবে ঐ প্রতিষ্ঠানে ঘুষের পরিমাণ ১০০ শতাংশ বেড়েছে? কারণ, এখানে শতকরা হারে দুর্নীতিকে যত বড় মনে হয়, টাকার অঙ্কে আসলে তা নয়। অনেক সময় শতাংশ ঘটনাকে বাস্তবতার চেয়েও বড় করে দেখাতে পারে।

সংখ্যার চিত্রায়ণ

অনেক সময় কোনো কোনো সংখ্যা এত বড় হয়, যে পাঠক বা দর্শক তা কল্পনা করতে পারেন না। তখন ঐ সংখ্যাটি গুরুত্ব হারায়। যেমন : ৩০০ কোটি ডলার। পাঠকমাত্রই বুঝতে পারবেন না ৩০০ কোটি বা ৩ বিলিয়ন ডলারে আসলে কত টাকা হয়। এ ধরনের সংখ্যার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা করলে পাঠকসংখ্যার বিশালত্বকে কল্পনা করে নিতে পারেন। যেমন : বাংলাদেশ থেকে গড়ে প্রতিবছর বৈদেশিক বাণিজ্যের আড়ালে ৩০০ কোটি ডলার পাচার হয়। যা দিয়ে একটি পদ্মা সেতু তৈরি করা সম্ভব।

এ ধরনের তুলনার ক্ষেত্রে লেখকের কল্পনাশক্তি ও পর্যাপ্ত গবেষণা থাকতে হবে। কারণ, লেখক বড় একটি সংখ্যাকে সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা করলে তা পরিষ্কার নাও হতে পারে। আবার যার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে, তার প্রকৃত ব্যয় সম্পর্কে তথ্যও জানা থাকতে হবে।

মাথাপিছু বিশ্লেষণ

ধরা যাক, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতে ৯ হাজার ৪৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বরাদ্দের অঙ্কটি অনেক বড় এবং এর সঙ্গে পাঠকের সম্পর্ক স্থাপন করা খুব কঠিন। এ ধরনের তথ্যকে মাথাপিছু হারে ব্যাখ্যা করে ভালো ফল পাওয়া যায়। টাকার মোট অঙ্ককে জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলেই মাথাপিছু বরাদ্দ বেরিয়ে আসে। এ ক্ষেত্রে, গত অর্থবছরে সরকার একেক জন নাগরিকের পেছনে স্বাস্থ্যবাবদ প্রায় ৬০০ (৫৯১ টাকা) টাকা খরচ করেছে বললে সংখ্যাটি অনেক অর্থবহ ও সহজ হয়।

একক বিভ্রাট

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, আমরা প্রতিবেদন তৈরির সময় মিলিয়ন, বিলিয়ন, কোটি, লাখ গুলিয়ে ফেলি। প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে একটি এককই ব্যবহার করা উচিত। যদি লাখ বা কোটি হয়, তাহলে শুধুই দেশি একক। আর মিলিয়ন-বিলিয়ন হলে শুধুই বিদেশি একক।

অনেক সময় মিলিয়ন বা বিলিয়নকে লাখ বা কোটিতে রূপান্তর করতে গিয়ে বিভ্রান্ত হতে হয়। জানা থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ করেই মিলিয়নে কত লাখ, বা বিলিয়নে কত কোটি তা নিয়ে গোলমাল বেধে যায়। তাই এককগুলো সম্পর্কে তথ্য মাথায় গেঁথে রাখা ভালো।

১ মিলিয়ন = ১০ লাখ
১০০ লাখ = ১ কোটি
১ বিলিয়ন = ১০০০ মিলিয়ন = ১০০ কোটি
১ ট্রিলিয়ন = ১০০০ বিলিয়ন = ১ লাখ কোটি

দশম অধ্যায়

শব্দকোষ

বাজেট শব্দকোষ

Allocation
Money earmarked for a particular purpose in the budget (like education, health, etc.).

বরাদ্দ
নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনে (যেমন—শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি খাতে) প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ।

Annual Financial Statement
Annual Financial Statement is a factual statement of receipts and expenditure for the financial year, presented to the Parliament by the government.

বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি
প্রতি অর্থবছরের জন্য সরকারের অনুমিত আয় ও ব্যয়সংবলিত একটি বিবরণ, যা সংসদে উপস্থাপিত হয়।

Assets (Public)
Things that the government owns or controls that are of value.

সম্পদ (সরকারি)
সম্পদ বলতে ঐ সব বস্তুকে নির্দেশ করা হয়, যার ওপর সরকারের মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং যার নির্দিষ্ট মূল্য আছে।

Audit
The assessment of the organization's systems and procedures that aims at minimizing errors, fraud, and inefficiency.

নিরীক্ষা
একটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন যার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার ভুলভ্রান্তি, জালিয়াতি ও অদক্ষতা চিহ্নিতকরণ এবং কমিয়ে আনা সম্ভব হয়।

Government Budget

Statement of a Government's estimated receipts and expenditure for a particular period, normally a year. In Bangladesh the Government Budget is a statement of estimated receipts and expenditures for one year starting each July as well as projected receipts and expenditure for the following four years.

সরকারি বাজেট

একটি নির্দিষ্ট অর্থবছরের জন্য সরকারের প্রাক্কলিত আয় ও ব্যয়ের বিবৃতিসংবলিত তথ্যাদির সমষ্টিই হলো সরকারি বাজেট। বাংলাদেশে অর্থবছর জুলাই মাসে শুরু হয়ে পরবর্তী বছরের জুন মাসে শেষ হয়।

Deficit

The difference between budget expenditure and budget revenue.

বাজেট ঘাটতি

বাজেটে ব্যয়ের চেয়ে আয় যতটুকু কম হয় তা-ই ঘাটতি। বাজেটে প্রাক্কলিত আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে বাজেট ঘাটতির সৃষ্টি হয়। প্রাপ্তি ও ব্যয়ের নেতিবাচক ব্যবধানই হলো ঘাটতি।

Development Budget (or Annual Development Program)

It includes development activities (investment projects, like water and sanitation, roads and bridges, electricity and telecommunication) and is financed from both domestic and foreign sources.

উন্নয়ন বাজেট (বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি)

সব ধরনের দীর্ঘমেয়াদি কর্মকাণ্ড (বিনিয়োগ প্রকল্প যেমন—পানি ও পয়োনিষ্কাশন, রাস্তা ও সেতু, বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ) পরিচালনার জন্য প্রণীত বাজেট।

Direct Tax

Tax that is imposed directly on the taxpayer, i.e. that are paid by the taxpayer directly into the budget, (for instance, tax on profits, income tax, tax on gifts and inheritances and so on).

প্রত্যক্ষ কর

যে করের বোঝা করদাতা অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপাতে পারে না, অর্থাৎ—করের বোঝা করদাতাকেই বহন করতে হয়, সে করকে প্রত্যক্ষ কর বলে। যেমন, আয়কর।

Expenditure
Funds disbursed from this account for government operations and the purchase of non-financial assets.

ব্যয়
সরকারের কার্যক্রম পরিচালনা এবং ভৌত সম্পদ সংগ্রহের জন্য সরকারি কোষাগার থেকে যে অর্থ ব্যবহার করা হয়, সেটিই ব্যয়।

Fiscal Policy
Government actions with regards to aggregation of revenue and spending, and the resulting surpluses or deficits.

রাজস্ব নীতি
কর, ব্যয় এবং ঋণ-ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা।

Fiscal Year
Fiscal Year is the government's 12-month accounting period. In Bangladesh it is from July to June, which does not coincide with the calendar year.

অর্থবছর
যে ১২ মাস সময়ের ভিত্তিতে সরকারের হিসাব কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে অর্থবছর জুলাই থেকে জুন।

GDP
GDP is Gross Domestic Product is the market value of all officially recognized final goods and services produced within a country in a given period (per year).

জিডিপি
মোট দেশজ উৎপাদন। একটি নির্দিষ্ট বছরে দেশে উৎপাদিত সব পণ্য ও সেবার (সরকারিভাবে স্বীকৃত) বাজারমূল্য।

Grants
Funds that the national government disburses directly to lower levels of government, corporations or other organizations, either for specific or for general purposes.

অনুদান

সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বা সরকারকে প্রদত্ত অর্থ বা সম্পদ যার বিনিময়ে কিছু প্রদান করতে হয় না। অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ বা সম্পদ পরিশোধ করতে হয় না।

Indirect Tax

Tax on goods and services that is collected indirectly, via an agent such as an importer, producer or shop (for instance, VAT, excise, customs duty, turnover tax).

পরোক্ষ কর

যে করের বোঝা উৎপাদক/সরবরাহকারী/বিক্রেতার পরিবর্তে ভোক্তাকে বহন করতে হয় তাকে পরোক্ষ কর বলে। যেমন, মূল্য সংযোজন কর।

Medium Term Budget Framework

The three year revenue and expenditure plans of the national government.

মধ্যমেয়াদি বাজেট-কাঠামো

তিন বছর মেয়াদি বাজেট-কাঠামো, যা সরকারের নীতি এবং উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পদের এবং সম্পদের সঙ্গে কর্মকৃতি বা ফলাফলের সম্পর্ক স্থাপন করে।

Non-Development Budget

Part of the budget concerned with current realities (maintenance of essential services, including public officials' salaries, and social safety payments) and financed from domestic resources.

অনুন্নয়ন বাজেট

বিভিন্ন প্রকার সেবাকে অব্যাহত/চলমান রাখার জন্য যে সম্পদ বরাদ্দ করা হয়। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (যেমন—ওষুধ ও পুস্তক) এবং অন্য সেবাসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

Public Financial Management

The legal and administrative systems and procedures put in place to permit government ministries, public agencies and local governments to conduct their activities so that the use of public funds meets defined standards of probity, regularity, efficiency, and effectiveness.

সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা

আইনগত এবং প্রশাসনিক পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া—যার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়, সরকারি সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এতে নির্দিষ্ট মান অনুসরণ করে দক্ষতার সঙ্গে সরকারি অর্থের ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

Project

Part of a program of a predefined duration, with planned expenses for the achievement of the goals set by a program.

প্রকল্প

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য/লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত কার্যক্রম যা সাধারণ কর্মকাণ্ডের দ্বারা সম্পন্ন করা সম্ভব নয় এবং যার একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদ এবং সম্পদ বরাদ্দ থাকে।

Public Sector

Part of the national economy that in the widest sense comprehends all levels of government, the welfare system and public corporations.

সরকারি খাত

জাতীয় অর্থনীতির একটি অংশ, যাতে বৃহৎ পরিসরে সরকারের সব সংস্থা প্রতিষ্ঠান, জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম এবং সরকারি করপোরেশন অন্তর্ভুক্ত।

Public Debt

Total indebtedness of the country to home or foreign creditors at a given moment.

সরকারি ঋণ

একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে সরকারের নেয়া মোট ঋণ।

Revenue

Amount of money the state collects from public in a given period of time, including taxes paid by citizens and businesses (typically, individual and corporate income taxes, payroll taxes, value-added taxes, sales taxes, levies, and excise taxes).

রাজস্ব

একটি নির্দিষ্ট সময়ে রাষ্ট্র কর্তৃক জনগণের কাছে সেবার বিনিময়ে সংগৃহীত রাজস্ব ও ফিস (যেমন, ব্যক্তিগত ও করপোরেট আয়কর, মূল্য সংযোজন কর, বিক্রয় কর ইত্যাদি)।

Subsidies

Subsidies are non-repayable state aid to producers or consumers subject to a specific type of business or behavior of the recipient.

ভর্তুকি

বাজারমূল্যের চেয়ে কম মূল্যে কোনো দ্রব্য বা সেবা বিক্রয় বা সরবরাহের জন্য সরকার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট উৎপাদক/সরবরাহকারী/বিক্রেতাকে প্রদেয় অর্থ সহায়তাই হলো ভর্তুকি।

Surplus
Excess of revenue over expenditure in a given period.

উদ্বৃত্ত
একটি নির্দিষ্ট সময়ে ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি থাকা।

Value Added Tax
An indirect sales tax charged at every stage of production and distribution, for all final parchases of goods and services. It is burdened on the final consumer of goods/services, but the actual taxpayer to the budget is the provider of goods and services.

মূল্য সংযোজন কর
সব ধরনের চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্য ও সেবা উৎপাদনের প্রতিটি পর্যায়ে আরোপিত পরোক্ষ বিক্রয় কর। পণ্য/সেবার মূল্য চূড়ান্ত ক্রেতার ওপর এ কর বর্তালেও সরবরাহকারীই ঐ পণ্যের প্রকৃত করদাতা।

অডিট শব্দকোষ

Accountability
That responsibility to some outside or higher level of Authority by a person or group of persons in an organisation.

জবাবদিহি
অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে (বাইরের) বা ব্যক্তিবর্গের কাছে প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের একজন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দায়বদ্ধতা বা জবাবদিহি।

Auditee or Audited Body or Entity
The body, organisation or entity for which the C&AG is responsible for auditing.

নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠান
(সেই) প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন, যার নিরীক্ষার জন্য মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (দায়ী বা) দায়িত্বপ্রাপ্ত।

Competitive Bidding

Competitive bidding is a selection process based on the principle of open and transparent advertisement of an item or service, which ensures that the best bidder wins according to qualifications, value and other objective criteria (and consequently not according to family or friendship ties, bribery or threats). Competitive bidding processes are often required by law on public contracts and purchases above a certain value.

প্রতিযোগিতামূলক নিলাম

বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যেকোনো পণ্য অথবা সেবার উন্মুক্ত নিলাম যা যোগ্যতা, মূল্য এবং অন্যান্য উল্লেখ্য নির্দেশনা মেনে (অবশ্যই পরিবার, বন্ধুত্ব, ঘুষ বা ভয়ভীতি ব্যতিরেকে) সর্বোচ্চ দরদাতাকে ডাকের মাধ্যমে শনাক্ত করা।

Contracting Out

A process, usually following competition, by which a government body pays a private provider to deliver a service, either to itself (e.g. the maintenance of public buildings) or to the public (e.g. collecting household waste).

চুক্তি অনুমোদন

প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিমালিকানাধীন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে তার সেবার বিপরীতে সরকার সব পাওনা মিটিয়ে থাকে, তা নিজের জন্য হোক (সরকারি দালানকোঠা মেরামতে) কিংবা জনগণের জন্য (বাড়ি বাড়ি গিয়ে ময়লা সংগ্রহ)।

Economy

Minimising the cost of resources used for an activity, having regard to the appropriate quality.

সাশ্রয়

কোনো কাজ সম্পাদনের সময় (সম্পদের) যথাযথ মানের প্রতি দৃষ্টি রেখে, প্রয়োজনীয় ব্যবহৃত সম্পদের ব্যয়ভার কমানো।

Effectiveness

The extent to which objectives are achieved and the relationship between the intended impact and the actual impact of an activity.

কার্যকারিতা

যে পর্যায়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় এবং যেকোনো কাজের অভীষ্ট ও অর্জিত ফলাফলের মধ্যে সম্পর্ক।

Efficiency

The relationship between the output, in terms of goods, services or other results, and the resources used to produce them.

দক্ষতা

উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত দ্রব্য, সেবা বা ফলাফল এবং উৎপাদনে যেসব সম্পদ ব্যবহৃত হয়েছে।

Embezzlement

Embezzlement is the misappropriation of property or funds legally entrusted to someone in their formal position as an agent or guardian.

তছরুপ

পদাসীন অবস্থায় রক্ষক হিসেবে সম্পদ বা আর্থিক বিবরণাদি ও হিসাবসংক্রান্ত রেকর্ডপত্রাদির ইচ্ছাকৃত বিকৃতি এবং/অথবা পরিসম্পদ তছরুপ।

Financial Audit

An independent assessment, resulting in a reasonable assurance opinion, of whether an entity's reported financial condition, results, and use of resources are presented fairly in accordance with the financial reporting framework.

অর্থসংক্রান্ত নিরীক্ষা

উন্মুক্ত যাচাই (পরামর্শ), যেকোনো সংস্থার আর্থিক অবস্থার প্রতিবেদন, ফলাফল যুক্তিযুক্ত এবং দৃঢ় মতামতের ভিত্তিতে হয় এবং আর্থিক প্রতিবেদন-কাঠামো মেনে সম্পদের ব্যবহার সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়।

Findings (or Observations)

Findings (observations) are the specific evidence gathered by the auditor to satisfy the audit objectives. the results of an audit on the basis of the evidence obtained.

অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ফল

অনুসন্ধান (পর্যবেক্ষণ) হচ্ছে নিরীক্ষক কর্তৃক সংগ্রহকৃত যথাযথ প্রামাণিক দলিল, যা হিসাবনিরীক্ষণের নির্দেশনা মোতাবেক হবে, প্রাপ্ত প্রমাণ সাপেক্ষে নিরীক্ষণের ফলাফল নির্ধারিত হয়।

Fraud

Fraud is economic crime involving deceit, trickery or false pretences, by which someone gains unlawfully. An actual fraud is motivated by the desire to cause harm by deceiving someone else, while a constructive

fraud is a profit made from a relation of trust. Synonyms Swindle, deceit, double-dealing, cheat, and bluff.

প্রতারণা

প্রতারণা হচ্ছে এক ধরনের অর্থনৈতিক অপরাধ, যেখানে অসৎ (অসততা), চাতুরী, হুমকি প্রয়োগে বেআইনিভাবে (আইনবহির্ভূত) অর্থ আদায়, প্রভাব বিস্তার, স্বজনপ্রীতি, প্রতারণা কিংবা তছরুপের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য সরকারি ক্ষমতা, দপ্তর কিংবা কর্তৃত্বের অপব্যবহার করা হয়।

Internal Control

The whole system of financial and other controls, including the organisational structure, methods, procedures and internal audit, established by management within its corporate goals, to assist in conducting the business of the audited entity in a regular economic, efficient and effective manner ensuring adherence to management policies safeguarding assets and resources securing the accuracy and completeness of accounting records and producing timely and reliable financial and management information.

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ

নিয়মিত আর্থিক, দক্ষতা এবং কার্যকরী নিরক্ষণীয় বিষয়ে সহায়তাদানে নিজ সংস্থার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ব্যবস্থাপকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সেই সংগঠনের গঠন, প্রক্রিয়া, কার্যবিধি এবং অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষণসহ আর্থিক ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা পরিচালিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে, ব্যবস্থাপনা নীতিমালার প্রতি আনুগত্য, সম্পদ ও সম্ভাবনা নিরাপত্তা নিশ্চিত রাখা, নিরীক্ষিত দলিলের শুদ্ধতা ও পূর্ণাঙ্গতা রক্ষা করা। সময়োচিত এবং নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থাপনাবিষয়ক তথ্য প্রদান।

Joint Venture

A jointly owned company set up by private and public sectors to complete a project which brings benefits to both parties

যৌথ উদ্যোগ

সরকারি ও ব্যক্তি যৌথ মালিকানাধীন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, যা উভয় পক্ষের লাভের জন্য একই কর্মপরিকল্পনা সম্পাদন করে।

Regularity Audit

Regularity audit includes (a) attestation of financial accountability of accountable entities, involving examination and evaluation of financial records and expression of opinions on financial statements (b) attestation of financial accountability of the government administration as a whole (c) audit of financial systems and transactions, including evaluation of

compliance with applicable statutes and regulations (d) audit of internal control and internal audit functions (e) audit of the probity and propriety of administrative decisions taken within the audited entity and (f) reporting of any other matters arising from or relating to the audit that the Supreme Audit Institution considers should be disclosed. The terms regularity audit and financial audit are often used interchangeably. Such references to audits includes an audit of financial statements, and some or all of the elements set out above, depending on the mandate of the Supreme Audit Institution.

রেগুলেটরি/কৌশলগত নিরীক্ষা

রেগুলেটরি নিরীক্ষায় রয়েছে (ক) জবাবদিহিতে বাধ্য, এমন সব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, যাতে রয়েছে অর্থসংক্রান্ত দলিলাদির পরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই এবং আর্থিক বিবৃতিতে মতামতের ধরন। (খ) সার্বিকভাবে সরকারি প্রশাসনের আর্থিক জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ। (গ) আর্থিক ব্যবস্থা ও লেনদেনসহ যেসব বিধিবিধান মেনে চলার কথা তা সঠিকভাবে মেনে চলা হয়েছে কি না, তা নিরীক্ষণ। (ঘ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং নিরীক্ষণ কার্যক্রমের নিরীক্ষণ। (ঙ) সংগঠনের মধ্যে সততা ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিরীক্ষণ। এবং (চ) যদি সর্বোচ্চ নিরীক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান মনে করে অন্য যেকোনো বিষয়ের অবহিত হওয়া দরকার সেটা।

Supreme Audit Institution

The public body of a State which, however designated, constituted or organized, exercises by virtue of law, the highest public auditing function of that State. In some Supreme Audit Institutions there are a single appointed Auditor General who acts in a role equivalent to that of engagement partner and who has overall responsibility for public sector audits. Other Supreme Audit Institutions may be organized as a Court of Accounts or having a collegiate or board system.

সর্বোচ্চ নিরীক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান

দেশের সরকার, তার যে পদই থাকুক না কেন, সাংবিধানিক অথবা সংগঠিত, আইনের শাসনে বিশ্বাসী, হচ্ছে সর্বোচ্চ নিরীক্ষণকারী। কোনো কোনো সর্বোচ্চ নিরীক্ষণকারী প্রতিষ্ঠানে মহানিরীক্ষক হিসেবে একজনকেই নিয়োগ দেওয়া হয়, যিনি সমসঙ্গী হিসেবে সব সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। কলেজিয়েট কিংবা বোর্ড রূপেও অনেক সর্বোচ্চ নিরীক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান দেখা যায়।

Value for Money or Performance Audit

An objective and systematic review of an organisation to assess whether in the pursuit of predetermined goals it has achieved economy, efficiency and effectiveness in the utilization.

ভ্যালু-ফর-মানি (ভিএফএম) অডিটের কার্যক্রম
কোনো প্রতিষ্ঠান পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যবহারে মিতব্যয়িতা, দক্ষতা ও ফলপ্রসূতা অর্জন করেছে কি না, তা মূল্যায়নের জন্য বস্তুনিষ্ঠ ও প্রণালিবদ্ধ পর্যালোচনা।

সরকারি ক্রয় শব্দকোষ

Administrative Authority
The concerned Procuring Entity, Head of the Procuring Entity and Secretary of the Ministry or Division respectively.

প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ
সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী, ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান, মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব।

Applicant
Person who seeks to become enlisted under the Limited Tendering Method under Section 32 (a) of the Act or to be pre-qualified in response to an Invitation for Pre-Qualification under Part-2 of Chapter Six of the Act, or to be short-listed in response to a request for Expression of Interest under Section 54 of the Act.

আবেদনকারী
সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে প্রাক্‌যোগ্য হিসেবে তালিকাভুক্ত হতে অথবা ইচ্ছাপত্র চেয়ে ক্রয়কারীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত হতে আগ্রহী ব্যক্তি।

Approving Authority
The authority which, in accordance with the Delegation of Financial Powers, approves the award of contract for the procurement of Goods, Works or Services.

অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ অনুযায়ী পণ্য, কাজ বা সেবা ক্রয়ের জন্য চুক্তি সম্পাদনের অনুমোদন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ।

Code of Ethics
The set of conditions and provisions which a Person shall abide while participating in public Procurement.

নৈতিক বিধি

ক্রয়কাজে অংশগ্রহণের সময় কোনো ব্যক্তিকে যেসব শর্ত বা বিধান অবশ্যই পালন করতে হয়।

Completion Date

The date of completion of the Works as certified by the Project Manager.

সমাপ্তির তারিখ

প্রকল্প ব্যবস্থাপক কর্তৃক প্রত্যায়িত কাজ সমাপ্তির তারিখ।

Consultant

Person under contract with a Procuring Entity for providing intellectual and professional services.

পরামর্শক

বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা প্রদানের জন্য ক্রয়কারীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি।

Contractor

Person under contract with a Procuring Entity for the execution of any Works.

ঠিকাদার

কোনো কার্য সম্পাদনের জন্য ক্রয়কারীর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তি।

Contract Price

The price stated in the Notification of Award and thereafter as adjusted in accordance with the provisions of the Contract.

চুক্তি-মূল্য

চুক্তিপত্রে উল্লেখিত মূল্য এবং পরবর্তী সময়ে চুক্তির সংস্থান অনুযায়ী সমন্বয়কৃত মূল্য।

CPTU

The Central Procurement Technical Unit, established by the Implementation Monitoring and Evaluation Division of the Ministry of Planning, for carrying out the purposes of the Act and these Rules.

সিপিটিইউ

ক্রয় আইন ও বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণের স্বার্থে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে স্থাপিত সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট।

Defect

Any part of the Works not completed in accordance with the Contract.

ত্রুটি
চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী কোনো কাজের অনিষ্পন্ন অংশ।

Delegation of Financial Powers
The instructions with regard to the delegation of financial authority, issued by the from time to time, relating to the conduct of public Procurement or sub-delegation of financial powers under such delegation.

আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ
সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন পর্যায়ের ব্যক্তি কত টাকা পর্যন্ত খরচের অনুমোদন দিতে পারবে সেই বিধান রেখে বিভিন্ন সময় সরকারের জারি করা আদেশ।

Delegated Procurement
A procurement undertaken by a specialised Procuring Entity on behalf of a Ministry, Division, Department or Directorate when the beneficiary entity delegates the task to such Procuring Entity.

অর্পিত ক্রয়কাজ
কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর বা পরিদপ্তরের পক্ষে কোনো ক্রয়কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যবহারকারী সত্তা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ক্রয়কার্যে পারদর্শী কোনো ক্রয়কারীর ওপর তা সম্পাদনের জন্য অর্পিত ক্রয়কাজ।

---

e-GP
Procurement by a Procuring Entity using electronic processing systems.

ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ক্রয়
ইলেকট্রনিক পরিচালন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে ক্রয়।

Evaluation Committee
Tender or a Proposal Evaluation Committee constituted under Section 7 of the Act.

মূল্যায়ন কমিটি
ক্রয় আইনের ধারা ৭-এর অধীনে গঠিত দরপত্র বা প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি। যারা দরপত্রে দেয়া শর্তের সঙ্গে ঠিকাদারের দেয়া প্রস্তাব যাচাই করে।

Evaluation Report
The report prepared after the evaluation of Tenders, Quotations, Expressions of Interest or Proposals.

মূল্যায়ন প্রতিবেদন
আবেদনপত্র, দরপত্র বা কোটেশনের মাধ্যমে কাজ পেতে আগ্রহীদের প্রস্তাব বা ইচ্ছাপত্র মূল্যায়নের পর অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করা প্রতিবেদন।

Force Majeure
An event or situation beyond the control of the Contractor, a Supplier or Consultant that is not foreseeable, is unavoidable, and its origins not due to negligence or lack of care on the part of the Contractor such events may include, but not be limited to, acts of the Government in its sovereign capacity, wars or revolutions, fires, floods, epidemics, quarantine restrictions, and freight embargoes.

দৈবদুর্ঘটনা
এমন কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতি, যার ওপর ঠিকাদার, সরবরাহকারী বা পরামর্শকের নিয়ন্ত্রণ নেই, যা তাদের অবহেলা বা অযত্নের কারণে উদ্ভূত নয়, অথবা যা অপ্রত্যাশিত কিন্তু অবশ্যম্ভাবী। সরকার সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পাদিত কোনো কাজ, যুদ্ধ, বা বিপদ, অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, মহামারি, সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য আরোপিত বিধিনিষেধ এবং মালামাল পরিবহণে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা (freight embargoes)-এর অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু কেবল এর মধ্যেই সীমিত নয়।

Framework Contract
A contract, effective for a given period of time, between one or more Procuring Entities and one or more Suppliers, establishing the terms governing the Procurement of Goods and related Services, with regard to price, and, where appropriate, the quantity or quantities envisaged.

রূপরেখা চুক্তি
পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবার মূল্য বা পরিমাণ সম্পর্কে নির্দিষ্ট শর্ত রেখে এক বা একাধিক ক্রয়কারীর সঙ্গে এক বা একাধিক সরবরাহকারীর একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পাদিত চুক্তি।

Goods
Raw materials, products and equipment and objects in solid, liquid or gaseous form, electricity, and related Services if the value of such Services does not exceed that of the Goods themselves.

পণ্য
কাঁচামাল, উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য ও যন্ত্রপাতি এবং কঠিন, তরল বা বায়বীয় আকারে পণ্যদ্রব্য, বিদ্যুৎ ও পণ্য সংশ্লিষ্ট সেবা, (এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সেবার দাম পণ্যের দামের চেয়ে বেশি হতে পারবে না)।

Head of the Procuring Entity

The Secretary of a Ministry or a Division, the Head of a Government Department or Directorate or the Chief Executive, by whatever designation called, of a local Government agency, an autonomous or semi-autonomous body or a corporation, or a corporate body established under the Companies Act.

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান

কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব, সরকারি অধিদপ্তর বা পরিদপ্তরের প্রধান বা পদ নির্বিশেষে কোনো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত বা আধাস্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, করপোরেশন অথবা কোম্পানি আইনে নিবন্ধিত কোনো সংস্থার প্রধান নির্বাহী।

Intellectual and Professional Services

Services performed by Consultants with outputs of advisory, design, supervision or transfer of a know-how nature.

বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা

পরামর্শকের দেয়া পরামর্শ, প্রণীত নকশা, কাজের তত্ত্বাবধান বা ব্যবহারিক জ্ঞান হস্তান্তর।

Intended Completion Date

The date on which it is intended that the Contractor shall complete the Works as specified in the Contract and may be revised only by the Project Manager by issuing an extension of time or an acceleration order.

প্রত্যাশিত সমাপ্তির তারিখ

ঠিকাদারের কাজ শেষ করার প্রত্যাশিত তারিখ, যা চুক্তির বিশেষ শর্তে নির্ধারিত থাকে। প্রকল্প ব্যবস্থাপক এই তারিখ বাড়িয়ে দিতে পারেন বা কমিয়ে আনতে পারেন।

In Writing

Communication written by hand or machine duly signed and includes properly authenticated messages by facsimile or electronic mail.

লিখিতভাবে

যথাযথভাবে স্বাক্ষরযুক্ত হাতে লিখিত বা মুদ্রিত কোনো যোগাযোগ। ফ্যাক্স বা ইলেক্ট্রনিক বার্তাও এর অন্তর্ভুক্ত।

Multiple Dropping

Submitting Tenders to more than one place as designated by the Procuring Entity.

একাধিক স্থানে দাখিল

ক্রয়কারীর ঠিক করে দেয়া একাধিক স্থানে দরপত্র দাখিল।

Opening Committee

Tender Opening Committee (TOC) or a Proposal Opening Committee (POC) constituted under Section 6 of the Act.

উন্মুক্তকরণ কমিটি

নির্দিষ্ট সময় শেষে জমা পড়া দরপত্র বা প্রস্তাব খোলার জন্য গঠন করা কমিটি।

Physical Services

The following services with measurable outputs, either—(a) linked to the supply of Goods or execution of Works such as operation and maintenance of facilities or plant, surveys, exploratory drilling, or (b) stand-alone service type contracts such as security services, catering Services, geological Services or third party Services.

ভৌত সেবা

নিচের পরিমাপযোগ্য সেবা—

(ক) পণ্য সরবরাহ বা কাজ সম্পাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধা প্রদানকারী উপকরণ বা কোনো প্রতিষ্ঠানের ভবন ও সরঞ্জাম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, জরিপ, অনুসন্ধানমূলক খননকাজ।

(খ) নিরাপত্তা সেবা, পরিবেশ সেবা, ভূতত্ত্ববিষয়ক সেবা বা তৃতীয় পক্ষ প্রদত্ত সেবাসংক্রান্ত একক সেবাদানমূলক চুক্তি।

Pre-Qualification

A procedure for demonstrating qualifications as a pre-condition for being invited to Tender.

প্রাক্‌যোগ্যতা

দরপত্রে অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্য আহ্বান জানানোর প্রক্রিয়া।

Primary place

The office of the Procuring Entity where all Tenders shall be received and opened.

মূল স্থান

ক্রয়কারীর কার্যালয় যেখানে দরপত্র দাখিল ও উন্মুক্ত করা হয়।

Procurement

The purchasing or hiring of Goods, or acquisition of Goods through purchasing and hiring, and the execution of Works and performance of Services by any contractual.

ক্রয়

কোনো চুক্তির অধীনে পণ্য সংগ্রহ, ভাড়া করা বা ভাড়ার মাধ্যমে পণ্য আহরণ এবং কাজ বা সেবা সম্পাদন।

Procuring Entity

Procuring Entity having administrative and financial powers to undertake Procurement of Goods, Works or Services using public funds.

ক্রয়কারী

সরকারি তহবিলের অর্থ দিয়ে কোনো পণ্য, কাজ বা সেবা ক্রয়ের জন্য প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান।

Project Manager

The person named in the Contract or any other competent person appointed by the Procuring Entity and notified to the Contractor who is responsible for supervising the execution of the Works and administering the Contract.

প্রকল্প ব্যবস্থাপক

চুক্তি পরিচালনা এবং কাজ তদারকির জন্য ক্রয়কারীর নিযুক্ত করা ব্যক্তি।

Provisional sums

Amounts of money specified by the Procuring Entity in the Bill of Quantities which shall be used, at its discretion, for payments to nominated Subcontractors and other purposes detailed in the Tender Documents.

প্রভিশনাল সাম

কাজের পরিমাণগত হিসাবসংবলিত বিবরণীতে ক্রয়কারীর লেখা অর্থের পরিমাণ, যা ক্রয়কারীর ইচ্ছামাফিক মনোনীত সহ-ঠিকাদারকে অর্থ পরিশোধ বা প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় নির্বাহে খরচ হবে।

Public funds

Any funds allocated to a Procuring Entity under Government budget, or loan, grants and credits placed at the disposal of a Procuring Entity through the Government by the development partners or foreign states or organisations.

সরকারি তহবিল

সরকারি বাজেট থেকে ক্রয়কারীর জন্য বরাদ্দ অর্থ, অথবা সরকারের মাধ্যমে কোনো দাতা সংস্থার দেয়া অনুদান ও ঋণ।

Public Procurement

Procurement using public funds.

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট

সরকারি তহবিল দিয়ে ক্রয়।

Quotation

The priced offer in writing received from Tenderers for the Procurement of readily available standardised Goods, Works or physical Services subject to the threshold value as prescribed by these Rules.

কোটেশন

আর্থিক সীমা সাপেক্ষে, সহজলভ্য প্রমিত পণ্য, কাজ বা ভৌত সেবা ক্রয়ের জন্য দরপত্রদাতাদের কাছ থেকে লিখিতভাবে পাওয়া মূল্য জ্ঞাপক প্রস্তাব।

Responsive

Qualified for consideration on the basis of evaluation criteria so declared and specified in the Tender Document or in the request for Proposal Document.

গ্রহণযোগ্য

দরপত্র দলিল বা প্রস্তাবে ঘোষণা দেয়া তথ্য মূল্যায়নের পর যোগ্য হিসেবে বিবেচিত।

Review Panel

A panel comprised of specialists to review complaints submitted by a Person.

পর্যালোচনা প্যানেল

কোনো ব্যক্তির দাখিল করা অভিযোগ বিবেচনার জন্য বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত প্যানেল।

Secondary place

The other place(s), designated by the Procuring Entity in exceptional cases, where Tenders can be dropped but not opened.

অন্যান্য স্থান

দরপত্র দাখিলের বিকল্প স্থান, যা ক্রয়কারীই ঠিক করে দিয়েছে। সেখানে দরপত্র জমা নিলেও খোলা যায় না।

Services
Goods related Services, physical Services, or intellectual and professional Services.

সেবা
পণ্য সংশ্লিষ্ট, ভৌত সেবা বা বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা।

Short-list
A list of Applicants deemed suitable to be invited to submit Proposals for intellectual and professional Services following the evaluation of Expressions of Interest.

সংক্ষিপ্ত তালিকা
দরপত্র জমা দেয়ার জন্য যোগ্য আবেদনকারীদের তালিকা, যা সেবা দিতে আগ্রহীদের ইচ্ছাপত্র মূল্যায়নের ভিত্তিতে তৈরি।

Subconsultant
Any person or entity to whom/which the Consultants subcontract any part of the Services.

সহপরামর্শক
পরামর্শক কর্তৃক প্রদেয় সেবার কোনো নির্দিষ্ট অংশ সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি বা সংস্থা।

Subcontractor
A person or corporate body who has a Contract with the Contractor to carry out a part of the work in the Contract, which includes work on the Site.

সহ-ঠিকাদার
কাজের কোনো অংশ সম্পাদনের জন্য ঠিকাদারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ কোনো ব্যক্তি বা বিধিবদ্ধ সংস্থা।

Supplier
Person under contract with a Procuring Entity for the supply of Goods and related Services under the Act.

সরবরাহকারী
পণ্য ও সেবা সরবরাহের জন্য ক্রয়কারীর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তি।

Tender or Proposal

Tender or a Proposal submitted by a Tenderer or a Consultant for delivery of Goods, Works or Services to a Procuring Entity in response to an Invitation for Tender or a Request for Proposal and for the purposes of the Act, Tender also includes quotation.

দরপত্র বা প্রস্তাব

দরপত্র দাখিলের আহ্বান বা প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধের (যেখানে প্রযোজ্য) পরিপ্রেক্ষিতে কোনো দরপত্রদাতা বা পরামর্শক কর্তৃক পণ্য, কাজ বা সেবা সরবরাহের জন্য ক্রয়কারীর কাছে দাখিলকৃত পত্র বা প্রস্তাব।

Tender Document or Request for Proposal Document

Document provided by a Procuring Entity to a Tenderer or a Consultant as a basis for preparation of its Tender or Proposal.

দরপত্র দলিল বা প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ সংবলিত দলিল

দরপত্র বা প্রস্তাব তৈরির জন্য ভিত্তি হিসাবে দরপত্রদাতা বা পরামর্শকের কাছে ক্রয়কারীর সরবরাহ করা দলিল।

Tenderer

Person who submits a Tender.

দরপত্রদাতা

দরপত্র দাখিলকারী ব্যক্তি।

Works

All Works associated with the construction, reconstruction, site preparation, demolition, repair, maintenance or renovation of railways, roads, highways or a building, an infrastructure or structure or an installation or any construction work relating to excavation, installation of equipment and materials, decoration, as well as physical Services ancillary to Works, if the value of those Services does not exceed that of the Works themselves.

কাজ

রেলপথ, রাস্তা, সড়ক, মহাসড়ক বা কোনো ভবন, অবকাঠামো বা কাঠামো বা স্থাপনা নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, সাইট প্রস্তুতকরণ, অপসারণ, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ বা নবরূপদান, খনন, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সংস্থাপন, ডেকোরেশনসহ যেকোনো ধরনের নির্মাণকাজ এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন ভৌত সেবা, যার দাম কাজের দামের চেয়ে বেশি নয়।

Bid Clarification
A series of formally documented exchanges with one or more bidders aimed at clarifying any aspects of the bid that are unclear.

দরপত্রের ব্যাখ্যা
এক বা একাধিক দরদাতার কাছে তাদের জমা দেয়া প্রস্তাব সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যা চাওয়ার প্রক্রিয়া, যা পুরোপুরি লিপিবদ্ধ করা থাকে।

Bid Security
A returnable sum of money (usually a percentage of the contract value) payable by bidders as a guarantee that the bidder will, if selected, sign the contract.

দরপত্রের নিরাপত্তা জামানত
দরপত্র জমা দেয়ার সময় দরদাতার কাছ থেকে জমা রাখা ফেরতযোগ্য অর্থ। নির্বাচিত হওয়ার পর দরদাতা চুক্তি সই করবে, এমন নিশ্চয়তার জন্য এই জামানত রাখা হয়। সাধারণত চুক্তিমূল্যের নির্দিষ্ট শতকরা হারে এই টাকা জমা নেয়া হয়।

Bond
A legally enforceable guarantee given by a third party to guarantee the obligations of a supplier under a contract.

বন্ড
কোনো সরবরাহকারীর পক্ষে তৃতীয় পক্ষের দেয়া নিশ্চয়তা, চুক্তি ভঙ্গ করলে তখন সরবরাহকারীর দায় সেই তৃতীয় প্রতিষ্ঠান নেবে।

BOT (Build, Operate and Transfer)
A form of private sector financing of a public project where a project company is granted a concession to build, operate and manage a project for a specified period of time at the end of which the asset may be transferred to public ownership.

নির্মাণ, পরিচালনা ও হস্তান্তর
সরকারি প্রকল্পে বেসরকারি অর্থায়নের একটি পদ্ধতি। যেখানে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সেই প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। তারপর পরিচালনার মাধ্যমে তার বিনিয়োগ করা অর্থ তুলে নিয়ে, তা আবার সরকারের কাছে হস্তান্তর করে।

Change Order
A written instruction from the Contracting Authority to the Supplier to carry out changes to the requirements originally specified in the contract.

ক্রয় আদেশ পরিবর্তন বা ভেরিয়েশন
চুক্তির শর্তে পরিবর্তন এনে (কাজের পরিধি বাড়িয়ে বা কমিয়ে) সরবরাহকারীকে ক্রয়কারীর দেয়া লিখিত নির্দেশনা।

Condition of Contract
A 'Condition' of a contract (as opposed to a 'term') is a fundamental provision, a breach of which gives the party not in breach the right to treat the contract as at an end, regard itself as released from its obligations under the contract and to sue for damages.

চুক্তির শর্ত
ক্রয়কারীর সঙ্গে ঠিকাদারের করা চুক্তির সব শর্ত। কোনো পক্ষ এই শর্ত ভঙ্গ করলে, তখন অপর পক্ষ চুক্তি বাতিল করে তার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ চেয়ে আদালতে যেতে পারবে।

Cost Estimate
An assessment of the likely cost of a procurement, used for planning and budgeting purposes and as a benchmark for tender evaluation/ negotiation. Actual prices can be compared with an estimate as a measure of procurement performance.

ব্যয় প্রাক্কলন
কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন বা কেনাকাটার জন্য সম্ভাব্য খরচ। পরিকল্পনা পর্যায়ে ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ এই প্রাক্কলন তৈরি করে। এর ভিত্তিতেই দরপত্র মূল্যায়ন ও দর-কষাকষি হয়। দরদাতাদের প্রস্তাব ভালো না খারাপ তা এই প্রাক্কলনের সঙ্গেই তুলনা করে ঠিক করা হয়।

Expression of Interest
Notification received from a tenderer, usually in response to a public invitation to tender or pre-qualification, that it is interested in the supply of the goods, works or services described in the invitation.

ইচ্ছাপত্র
ক্রয়কারীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে কোনো পণ্য, কাজ অথবা সেবা ক্রয়ের প্রক্রিয়ায় প্রাক্-যোগ্য হিসেবে তালিকাভুক্তির ইচ্ছা জানিয়ে ঠিকাদারি বা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের জমা দেয়া পত্র।

Penalty Clause
A contract clause specifying the sum to be paid by the defaulting party to the other if the contract is not fulfilled. The sum is usually an estimate of the loss likely to be suffered by the party as a result of default.

জরিমানার ধারা
ক্রয় চুক্তিতে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার কথা উল্লেখ করে জরিমানার একটি ধারা রাখা হয়। চুক্তি অনুযায়ী কাজ না করলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ এই পরিমাণ টাকা পাবে।

Post Tender Negotiation (ptn)
Discussions with a tenderer or tenderers after a bid opening but before award of contract with a view to seeking improvement in the content of the bid(s).

দরপত্র-পরবর্তী আলোচনা
দরপত্র খোলা এবং কাজ দেয়ার মাঝামাঝি সময়ে প্রস্তাবের বিভিন্ন দিক নিয়ে দরদাতার সঙ্গে দর-কষাকষি।

Performance Bond/Security
A guarantee (bank guarantee or bond) executed by a contractor as security towards the performance and fulfilment of the contract terms and conditions agreed upon.

কার্যসম্পাদনের নিশ্চয়তা/নিশ্চয়তাপত্র
কাজের মান ও চুক্তির শর্ত পরিপালনের নিশ্চয়তা বাবদ ঠিকাদার বা সরবরাহকারীর জমা রাখা জামানত বা বন্ড। চুক্তির শর্তেই এই জামানতের কথা উল্লেখ থাকে।

Progress Payment
Periodic payments during delivery of a contract which is usually linked to different stages in the manufacturing process of a product or in construction.

অগ্রগতি অনুসারে পরিশোধ
কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে ঠিকাদারকে টাকা পরিশোধ। যেসব কাজ বা চুক্তি ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করতে হয়, সেখানে এই প্রক্রিয়া দেখা যায়।

Request for Proposals
A term usually used for consultancy contracts where the Contracting Authority invites proposals from selected candidates.

প্রস্তাব আহ্বান
পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে ক্রয়কারীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠানে কাজের প্রস্তাব পাঠানোর আমন্ত্রণ।

Request for Quotation (rfq)

A procurement method, usually used for low value items, where offers are invited from at least three tenderers without conducting a full Invitation to Tender procedure.

কোটেশন আহ্বান

সাধারণত খুব ছোট আকারের ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র না ডেকে ক্রয়কারীর বিবেচনা অনুযায়ী কমপক্ষে তিনটি প্রতিষ্ঠানের কাছে কোটেশন আকারে প্রস্তাব চাওয়া হয়।

Retention

The withholding of a percentage of payments made to a contractor during the course of a contract to accumulate a fund that is available to the purchaser if the contractor fails to rectify defects in accordance with the contract.

ধারণ/ধরে রাখা

কাজের কোনো পর্যায়ে ঠিকাদারকে প্রদেয় অর্থের কিছু অংশ ধরে রাখা। কাজে কোনো ভুল হলে, তা সংশোধন না করা পর্যন্ত এই টাকা আটকে রাখা হয়।

Specification

A statement of needs defining what the Contracting Authority wishes to purchase.

বিনির্দেশ

কর্তৃপক্ষ ঠিক কী ধরনের পণ্য বা কাজের উপকরণ ক্রয় করতে চায় তার বিস্তারিত বিবরণী। সেবার ক্ষেত্রে কাজের পরিধি তুলে ধরে টার্ম অব রেফারেন্স তৈরি করা হয়।

Two Stage Tendering

A procurement procedure where tenderers are first asked to present technical and organizational suggestions on how best to implement a specific project. The Contracting Authority identifies the proposal which is likely to be the most advantageous, and requests priced tenders in order to select the lowest evaluated tenderer.

দ্বিস্তর দরপত্র

এমন এক পদ্ধতি যেখানে প্রথমে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে কারিগরি প্রস্তাব চাওয়া হয়। এর ভিত্তিতে যোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাছাই করে তাদের কাছে আর্থিক প্রস্তাব চাওয়া হয়। সেখান থেকে সর্বনিম্ন দরদাতা খুঁজে বের করা হয়।

সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনার খবর যেসব ওয়েব ঠিকানায়

1. Finance Division, Ministry of Finance
   www.mof.gov.bd/en/
2. Planning Commission
   www.plancomm.gov.bd/
3. Implementation Monitoring and Evaluation Division
   www.imed.gov.bd/
4. Office of the Comptroller and Auditor General
   www.cagbd.org/
5. National Board of Revenue
   www.nbr-bd.org/
6. Laws of Bangladesh
   www.bdlaws.minlaw.gov.bd/
7. Central Procurement Technical Unit
   www.cptu.gov.bd/
8. Asian Development Bank
   www.adb.org/countries/bangladesh/main
9. The World Bank
   www.worldbank.org/en/country/bangladesh
10. Bangladesh Bank
    www.bangladesh-bank.org/
11. Transperancy International Bangladesh
    www.ti-bangladesh.org/
12. Local Consultative Groups in Bangladesh
    www.lcgbangladesh.org/
13. Gazette Archive, BG Press
    www.dpp.gov.bd/bgpress/index.php/document/gazettes/140

তথ্যসূত্র

১. বাজেট পাঠ সহায়িকা ২০১৩-১৪ (অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়)

২. Most Common Red Flags of Fraud and Corruption in Procurement (Integrity Vice Presidency, The World Bank)

৩. NATIONAL INTEGRITY SYSTEM ASSESSMENT BANGLADESH 2014 (Transperancy International Bangladesh)

৪. Anti-corruption policies in Asia and the Pacific: Thematic review on provisions and practices to curb corruption in public procurement, Self-assessment report Bangladesh (ADB-OECD)

৫. Improving Transparency in Public Procurement in Bangladesh: Interplay between PPA and RTI Act (Policy Note, BRAC IGS, Mohammad Sirajul Islam, Research Associate, Institute of Governance Studies, BRAC University, Dhaka.)

৬. Public Financial Management: The role of Supreme Audit Institution (SAI) of Bangladesh—Issues and Challenges (Ahmed Ataul Hakim FCMA)

৭. Public Expenditure and Institutional Review, Towards a Better Quality of Public Expenditure, 2010 (The World Bank)

৮. Glossary of Procurement Terms and Capacity Development (PICD)

৯. রিপোর্টারের জন্য—অডিট শব্দকোষ, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই), ২০১০

১০. Handbook of Journalism, The Reuters Style Guide
www.handbook.reuters.com/index.php?title=N#numbers

১১. Reporting averages, percentages and data (Academy, BBC)
www.bbc.co.uk/academy/journalism/article/art20130702112133476

১২. International Journal on Governmental Financial Management (Vol: VIII, No.02, 2008)

১৩. The Most Common Procurement Fraud Schemes and their Primary Red Flags (March 6, 2012 by W. Michael Kramer)
www.iacrc.org/procurement-fraud/the-most-common-procurement-fraud-schemes-and-their-primary-red-flags/

...সরকার খরচ করে জনগণের জন্য—এটা সম্পর্কের এক দিক। অন্য দিক হলো, সরকার এই টাকা নিচ্ছে জনগণেরই কাছ থেকে, আমার-আপনার দেয়া করের মাধ্যমে। তাই আমার টাকা সরকার কীভাবে খরচ করছে, দিন শেষে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। প্রত্যেক নাগরিকেরই তা জানার অধিকার আছে। আর এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টাই যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বড় বড় সব খবরের জন্ম দিয়েছে।